বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০১৪

দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের সুবাতাস বইছে। পাল্টে গেছে উন্নয়নের সংজ্ঞা। শুধু আয় নয়, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আর ইতিবাচক পরিবেশ -- এসবও এখন উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে মেনে নিয়েছেন বৈশ্বিক নীতিনির্ধারকরা। তারা স্বীকার করছেন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ মানসিক স্বাস্থ্য ছিল অকারণে উপেক্ষিত। তাই, ২০১৫-পরবর্তী নতুন, টেকসই মানবোন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এখন যে আলোচনা চলছে, সেখানে মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিবেশের স্থান অনেক উঁচু। এ সময়ে বাংলাদেশে আমরা যারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি তাদের একত্রিত হওয়ার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক। আগামীতে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। মানুষের অগ্রগতির একটি মূল স্তম্ভ আমাদেরকেই নির্মাণ করতে হবে, এই দায়িত্ববোধ নিয়ে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৭ম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি

'উন্নত জীবনের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি' - এই ভিশন স্টেটমেন্টকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি, এবং এরই মধ্যে পার করেছে গৌরবোজ্জল ১৫টি বছর। ১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর এই সংগঠনটি ৬জন জেনারেল মেম্বার, ১৭জন ট্রেইনি মেম্বার এবং ১ জন অ্যাফিলিয়েট মেম্বারসহ মোট ২৪জন কে নিয়ে এর যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন প্রফেসর আনিসুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন প্রফেসর মাহমুদুর রহমান। আজ ২০১৪ সালের ৭মার্চ তারিখ পর্যন্ত সোসাইটির মোট ১৭৩জন সদস্য দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং বহুবিচিত্র কর্মক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার প্রমাণ রেখে চলেছেন। এই ১৭৩ জনের মধ্যে ৩জন লাইফ মেম্বার, ৪৩জন জেনারেল মেম্বার, ৬২জন এফিলিয়েট মেম্বার এবং ৬৫জন ট্রেইনি মেম্বার।

বিভিন্ন দেশী বিদেশী পাবলিক ও প্রাইভেট হাসপাতাল, বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্বাবিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল, বিভিন্ন দেশী বিদেশী ও আন্তর্জাতিক এন-জি-ও এবং উন্নয়ন সংস্থায় বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির সদস্যদের দৃপ্ত পদচারনা লক্ষ্যণীয়। সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ভূমিকা যে আরও কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পাবে তা বলাইবাহুল্য।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৭ম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করার প্রাক্কালে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য প্রয়াত প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগমকে। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিসিপ্লিন এবং পেশার সার্বিক বিকাশে তাঁর অবদান বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি সকলকালেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে - অনুসরণ করার চেষ্টা করবে তাঁর আদর্শ ও কর্মপ্রয়াসকে।

সর্বশেষ সাধারণ সভা

২০১১ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ৬ষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর রোকেয়া বেগমের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সভায় সাধারণ সম্পাদক জনাব জহির উদ্দিন সোসাইটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন পেশ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য উপস্থিত সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান। সোসাইটির অর্থনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ এস.এম. আবুল কালাম আজাদ। আলোচনার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সোসাইটির গঠনতন্ত্র বিষয়ে কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব। এছাড়াও সোসাইটির সাধারণ সদস্য শাহনুর হোসেন ও জোবেদা খাতুন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের ক্লিনিক্যাল প্রাকটিস আওয়ার-এর একটি রেকর্ড ফর্ম উপস্থাপন করেন যা ৬মাস অন্তর সোসাইটির দপ্তরে জমা দেয়ার জন্য সোসাইটির সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হয়।

নির্বাচনী অধিবেশনটি রুদ্ধদ্বারে কেবলমাত্র সাধারণ সদস্যগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট অরুন্ধিয়া জায়েদিকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই নির্বাচিত হন। বাকি পদগুলোর জন্য গোপন ব্যালট হয়। সাধারণ সভায় নির্বাচিত ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি (৬ষ্ঠ কার্যনির্বাহী কমিটি) নিচে উল্লেখ করা হলো:

১) সভাপতি - কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী

২) সহ-সভাপতি - মো. জহির উদ্দিন
৩) সাধারণ সম্পাদক - তরুণ কান্তি গায়েন
৪) জয়েন্ট সেক্রেটারি - জোবেদা খাতুন
৫) অর্গানাইজিং সেক্রেটারি - রুমা খোন্দকার
৬) কোষাধ্যক্ষ - এস.এম. আবুল কালাম আজাদ
৭) সদস্য - প্রফেসর রোকেয়া বেগম
৮) সদস্য - সালমা পারভীন
৯) সদস্য - ইসরাত শারমীন রেহমান
১০) সদস্য - মোসাম্মত নাজমা খাতুন
১১) সদস্য - শাহনুর হোসেন

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির শেষ সভা

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির শেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে। সোসাইটির বর্তমান সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীসহ মোট ৮জন সদস্যের উপস্থিতিতে এই সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ৭ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার চূড়ান্ত প্রস্তুতির পর্যালোচনা। সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার উন্মুক্ত অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির প্রথম সভাপতি প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রফেসর ড. সুলতানা বানুকে বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিসিপ্লিন প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি-র যথাক্রমে আজীবন সদস্য এবং সম্মানিত সদস্যপদ প্রদান করা হবে। এছাড়াও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণেচ্ছুকদের রেজিস্ট্রেশন ফিস-ও নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির কার্যক্রম (২৪ ডিম্বের ২০১১ - ০৭ মার্চ ২০১৪)

গঠনগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির কার্যক্রম অনেকসময়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের কার্যক্রম থেকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখেই সোসাইটির কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১১-এ সোসাইটির শেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০১৪ সালের ৭মার্চ পর্যন্ত সোসাইটি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম ও কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর সংজ্ঞায়ন

এ সময়কালে সোসাইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জিং কাজ হচ্ছে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়নের কোন পর্যায়েই বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির কোন প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। অত্যন্ত গোপনে প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়াটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর একটি অনভিপ্রেত ও অবাস্তব সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। বিষয়টি কার্যনির্বাহী কমিটি জানতে পারা মাত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব বরাবর প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয় এবং সোসাইটি-নির্ধারিত সংজ্ঞা প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় সংযোজনের জন্য জোর আবেদন জানানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইনের দায়িত্বে নিয়োজিত আইনজীবী জনাব শাহরিয়ার-এর সঙ্গে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তি শেষে সোসাইটি-প্রদত্ত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর সংজ্ঞাটি গৃহীত হয়।

প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইনের শেষ পর্যায়ের খসড়াটি যখন কার্যনির্বাহী কমিটির হাতে আসে তখন তাতে দেখা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী হিসেবে এমবিবিএস ডিগ্রিধারী সাইকিয়াট্রিস্টদের পাশাপাশি এম.এস/এম.এসসি/ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথচ বাদ দেয়া হয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এম.এস ডিগ্রিধারীদের। বিষয়টি অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ বিধায় কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রস্তাবিত মানসিক স্বাস্থ্য আইনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এম.এস ডিগ্রিধারীদের সাইকোলজিস্ট (ক্লিনিক্যাল) হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হোক। এ মর্মে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব বরাবর সোসাইটির প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং এর অনুলিপি প্রস্তাবিত আইনের মুখ্য নিয়ন্ত্রক পেশাজীবীদের সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের বর্তমান পরিচালক প্রফেসর ওয়াজিউল আলম

মহোদয়ের সাথে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক তরুণ গায়েন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমান বৈঠক করে পৌঁছে দিয়েছেন।

সরকারি হাসপাতালে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর পদ সৃজন

সোসাইটির বিগত কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য কাঠামোতে পেশাজীবী হিসেবে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে এ পেশার স্বীকৃতির ইতিহাস রচিত হতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৫টি বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং ১০টি মেডিকেল কলেজে মানসিক বিভাগের জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর পদ সৃজন করা হয়েছে। এখানেও আমাদের নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণে সকল বাধা অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবিত পদগুলোর অর্গানোগ্রাম সচিব কমিটিতে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সচিব কমিটিতে অনুমোদনের পরেই পদগুলোর সার্কুলারের জন্য সরকারি আদেশ (জি.ও.) পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য কাঠামোতে পেশাজীবী হিসেবে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পদ সৃষ্টির এই অমূল্য প্রয়াসে শুরু থেকে অদ্যাবধি ক্লান্তিহীন উদ্যোগ ও নেতৃত্বদানের জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সোসাইটির প্রথম সভাপতি, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমানের অবদান বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এছাড়াও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পদ সৃষ্টির কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সোসাইটির পক্ষ থেকে কামরুজ্জামান মজুমদার, শাহনূর হোসেন, কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং তরুণ কান্তি গায়েন এর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

সাভার ট্র্যাজেডি ২০১৩

এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখে সাভারস্থ রানা প্লাজা ধ্বসের পরপরই (২৯ এপ্রিল) বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির ব্যানারে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও ট্রেইনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের সমন্বয়ে একটি টিম, সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি তরুণ গায়েন এবং সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্য সহকারী অধ্যাপক মোসাম্মত নাজমা খাতুনের নেতৃত্বে প্রথমে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে সাভার ক্যান্টনমেন্টস্থ কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালে যায়। এনাম মেডিকেল কলেজের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় টিমটি হাসপাতালে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে বহুসংখ্যক রোগী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে ও একটি তালিকা প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। কোন কোন রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক সহায়তা প্রদান করা হয়। নিয়মিত মানসিক সেবার প্রয়োজন রয়েছে এমন রোগীদের উপস্থিত ট্রেইনিদের মাঝে বন্টন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ট্রেইনিগণ এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়মিত গিয়ে নিষ্ঠার সাথে এই সেবা প্রদান করে এসেছেন। একইভাবে সাভার ক্যান্টনমেন্টস্থ কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটালের কম্যান্ডান্ট লে. কর্ণেল শরীফের আন্তরিক সহযোগিতায় হাসপাতালে অবস্থানরত রোগীদের সাথে কথা বলা হয়, তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং রোগীদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

রানা প্লাজা ভিকটিমদের প্রয়োজনীয় সাইকোলজিক্যাল সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি নানাবিধ উদ্যোগ নেয় এবং কর্মপ্রচেষ্টা চালায়। এরমধ্যে রয়েছে:

- ট্রমা ভিকটিমদের সাথে কাজ করার জন্য ট্রেইনিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান
- চিকিৎসারত ভিকটিমদের বিভিন্ন হাসপাতাল/ ইন্সটিটিউট ও কমিউনিটি আউটরিচে গিয়ে সেবা প্রদান
- এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড়ের প্রচেষ্টা চালানো
- একই কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ার প্রচেষ্টা

এই যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ক হিসাবে নিরলস কাজ করেছেন সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর সহকারী অধ্যাপক মোসাম্মত নাজমা খাতুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট-এর সহযোগী অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান মজুমদার।

রানা প্লাজা ভিকটিমদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি কাজ করার লক্ষ্যে সোসাইটির উদ্যোগে ড. কামরুজ্জামান মজুমদার একটি কমপ্রিহেনসিভ সার্ভিসযুক্ত প্রজেক্ট প্ল্যান তৈরি করেন। প্রজেক্ট প্ল্যানটি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশ করা হয়। তবে অদ্যাবধি কোন জায়গা হতে ইতিবাচক কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

রানা প্লাজা ভিকটিমদের সাথে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক দেশে-বিদেশে অবস্থানরত আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির প্রাক্তন ট্রেইনীগণ এবং এর বাইরেও ভিনদেশী শুভানুধ্যায়ী মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবিদের কাছে মুক্ত আহ্বান জানান সোসাইটির এ্যাকাউন্টে সাধ্যমতো অবদান রাখার জন্য। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র নিবাসী সাইকোড্রামার প্রশিক্ষক প্রফেসর হার্ব পপার মোট ২৬,০০০/- টাকা সোসাইটির ফান্ডে প্রদান করেছেন।

ট্রমা ভিকটিম এই সকল হতভাগ্য মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানের জন্য সেবা প্রদানকারী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিদের প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ ও ম্যানুয়েল দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'ওয়ার এন্ড চিলড্রেন' নামক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক নরওয়ের বিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট প্রফেসর অ্যাটলে ডাইরেগ্রোভ এবং যুক্তরাজ্য নিবাসী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ফারজিন হক।

এসময়কালে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য সহকারী অধ্যাপক শাহনুর হোসেন ট্রমা বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলায় একটি তথ্যসহায়িকা রচনা করেন। সোসাইটির অন্যতম সদস্য ড. গ্রাহাম পাওয়েল সহ অন্যান্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টগণের ফিডব্যাক বিবেচনায় তথ্যসহায়িকা চূড়ান্ত করেন। তথ্যসহায়িকাটি প্রিন্ট করতে অর্থ সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করেন চট্রগ্রামস্থ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান উৎস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোস্তফা কামাল যাত্রা।
সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রানা প্লাজা ভিকটিমদের মাঝে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিগণ যে সেবা প্রদান করেন তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেয়া হলো: (তথ্যসূত্র: মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন)

হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠান	কোঅর্ডিনেটর	ক্লায়েন্ট সংখ্যা	ব্যক্তিগত সেশন	দলগত সেশন	
				ক্লায়েন্ট	সেশন
NITOR	রুবিনা জাহান রুমী	৩৩	১০৪	৪৭	৩
DMCH	কানিজ ফাতেমা	২৫	৪৪		
ENAM Medical College Hospital	সালমা আফরোজা শাওন	২০	২৫		
CMH	ফারজানা সুলতানা নীলা	১৫	২০		
	সর্বমোট	৯৩	২০৩		

যেসকল ট্রেইনি বিভিন্ন পর্যায়ে রানা প্লাজা ভিকটিমদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সার্ভিস প্রদান করেছেন তারা হলেন:
রুবীনা জাহান রুমী, সাদেকা হোসেন, মারজান আখতার, আফরোজা আখতার, সাইমুননাসা, ফারহানা রহমান ইশিতা, শাহরিনা ফেরদৌস, শামসুন নাহার, মৌনিতা নওরীন, মিতা মন্ডল, কানিজ ফাতেমা, মৌমিতা নীলাভ, মুক্তা জাহান বানু, শুভ্রপ্রকাশ দে, রিফাত শারমিন, ফারজানা আখতার, ইসমত জেরিন, সালমা আফরোজ, শামীমা আখতার, ফারহানা মিঠু, নাফিসা আখতার।

ট্রেইনিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনটি গ্র "প সুপারভিশন সেশন এবং একটি দুদিনব্যাপী ট্রমা ফোকাসড সিবিটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১২

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১২ পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে ১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে একটি র‍্যালি বের করে। ২০১২ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "বিষণ্নতা: একটি বৈশ্বিক সংকট" । র‍্যালিটির উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালেয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ও তৎকালীন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আব্দুল মালেক। প্রায় ২০০ জনের এই সুসজ্জিত র‍্যালি মানসিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। র‍্যালি শেষে জাতীয় প্রেস

ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে বক্তাগণ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ দেন। এছাড়া ১০ অক্টোবর ও তার পরের দিন সময়োপযোগী ৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলোর বিষয় ছিল ''বিষণ্নতা ও আত্মহত্যা, "ক্যাম্পাস জীবনে চাপ", "অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নির্যাতন" এবং "কিশোর-কিশোরীদের সংকট" ।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের নাসিরুল্লা সাইকোথেরাপি ইউনিট ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস) ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে যৌথভাবে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৩ উদযাপন করে। ২০১৩ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য" । এ উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি র‍্যালি ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ সকাল ৯.৩০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন প্রধান অতিথি হিসেবে সকাল ৯.৩০টায় র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক।

র‍্যালিটি শেষে সকাল ১০.৩০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, কমকর্তা-কর্মচারীগণ ও সোসাইটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ, এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগ ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ ৪০০ জনেরও বেশি পেশাজীবী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

"প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য" -- এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে ঘিরে আমাদের স্লোগান ছিল পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের জীবন হোক আনন্দময় ।

- মানববন্ধনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্টরা যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করার সুপারিশ করেন সেগুলো হচ্ছে:
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে প্রবীণদের উৎসাহিত করা
- দ্রুত মানসিক রোগ শনাক্ত করে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা
- তাদের চিকিৎসায় পরিবার ও সমাজকে (কমিউনিটি) যুক্ত করা
- সরকারি সেবা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিওকে প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দানে যুক্ত করা
- অন্য প্রবীণদের চিকিৎসায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশ নিতে প্রবীণদের উৎসাহিত করা
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় করা, অর্থাৎ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দানের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা

প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম স্মরণসভা

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর.সি. মজুমদার হলে ড. রোকেয়া বেগমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ-এর যৌথ উদ্যোগে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়াম্যান ও সুপার নিউমেরারি অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করেন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদুর রহমান। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীব বিজ্ঞান অনুষদের মাননীয় ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। ভাইস প্রেসিডেন্টসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির ৬জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ছাড়াও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি ও মরহুমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, এডুকেশনাল ও কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকগণসহ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সেলিং ট্রেনিং

গত ০২.০৮.২০১২ থেকে ০৬.০৮.২০১২ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি-র যৌথ উদ্যোগে " Basic Counseling Skills "-এর ওপর একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটির উদ্বোধন

করেন সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সর্বোচ্চ মানসম্মত প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে সীমিত সংখ্যক (১৬ জন) অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এ প্রশিক্ষণ পর্বগুলো পরিচালনা করা হয়।

ড. নাসিরুল্লা সাইকোথেরাপী ইউনিট (এনপিউ) গঠনে ভূমিকা পালন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক 'ড. নাসিরুল্লা ফাউন্ডেশন' হতে "**Psychotherapy Development in Bangladesh**" প্রোগ্রামের আওতায় ৫ বছর মেয়াদি প্রায় ৫ কোটি টাকার একটি ফান্ড পায়। প্রখ্যাত বালাদেশি বাঙালি সাইকোএ্যানালিস্ট ড. নাসিরুল্লার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এই ফান্ড বাংলাদেশে সাইকোথেরাপির বিকাশে ব্যবহৃত হবে। এই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের আওতায় 'ড. নাসিরুল্লা সাইকোথেরাপি ইউনিট (এনপিউ)' নামের প্রকল্প অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০১৩-র এপ্রিল মাস থেকে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি পরিকল্পনার প্রথম থেকে ড. গ্রাহাম পাওয়েল-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির বর্তমান সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোসাম্মত নাজমা খাতুন। পরবর্তীতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছে সেখানে সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (প্রোগ্রাম ডিরেক্টর) ছাড়াও সোসাইটির সহসভাপতি মো. জহির উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ জনাব আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক তরুণ কান্তি গায়েন ও সোসাইটির অন্যতম সদস্য মোসাম্মত নাজমা খাতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের একটি প্রকল্প হিসেবে এনপিউ গঠনে বিভাগের চেয়ারম্যান (সোসাইটির কোষাধক্ষ্য) জনাব আবুল কালাম আজাদ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি বিশ্বাস করে এনপিউ-র সফলতা বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ভূমিকাকে আরও জোরদার হতে সাহায্য করবে। এই লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটিও 'ড. নাসিরুল্লা সাইকোথেরাপি ইউনিট' -কে একটি অত্যন্ত সফল প্রোগ্রাম হিসেবে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রকাশনা:

এসময়কালে বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি-র মুখপত্র মনভুবনের ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা এবং প্রয়াত প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করে। এসকল প্রকাশনার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন
সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধূরী।

সোসাইটির যেসকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মপ্রয়াস সফল হয়নি।

- **সেক্রেটারিয়েট ও রেজিস্ট্রেশন :**

বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি তার মেয়াদকালে সোসাইটির জন্য অফিস ভাড়া করতে ব্যর্থ হয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি সেক্রেটারিয়েট-এর কাঙ্খিত লোকেশনও এক্ষেত্রে বাঁধা হয়েছে। যেহেতুে কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সোসাইটির কর্মপ্রয়াস এখনও পর্যন্ত ট্রেইনি নির্ভর সুতরাং সঙ্গত কারণেই ধারণা করা হয়েছে যে, সোসাইটির সেক্রেটারিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে হওয়া বাঞ্চনীয়। অনেক অনুসন্ধান করেও অফিসভাড়ার ধার্যসীমার মধ্যে কোন বাসা এখনও অবধি পাওয়া যায়নি। অথচ সোসাইটির সরকারী রেজিষ্ট্রেশন পাবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে তার নিজস্ব কর্মব্যস্ত সেক্রেটারিয়েট।

- **৪র্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স :**

প্রধানত: অতি সংঘাতময় অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সোসাইটি তার প্রস্তাবিত ৪র্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স যথাসময়ে অনুষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভিন্নমতে বর্তমান নির্বাহী কমিটির সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনার অভাবে এটি করা সম্ভব হয় নাই। যাহোক, অবশেষে ১৪-১৭ আগস্ট ২০১৪ ৪র্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স-এর নতুন তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

- **প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম স্মৃতি রক্ষামূলক কর্মকান্ড:**

কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত উদ্যোগ ও সমন্বয়ের অভাবে এ বিষয়ক সকল কর্ম পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব হয় নাই। তবে, কমিটির অন্যতম সিদ্ধান্ত 'প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম মেমোরিয়াল লেকচার চলতি বছরেই প্রয়াত প্রফেসরের জন্মমাসে যেকোন দিন অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

বিগত সভাসমূহের আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ:

২ জানুয়ারি ২০১২

সভায় ১০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) বিসিপিএস-এর যাবতীয় অফিসিয়াল ডকুমেন্ট (মোবাইল ফোন, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি) নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব নাজমা খাতুনকে হস্তান্তর করা হয়। পাশাপাশি এ সমস্ত ডকুমেন্ট-এর তালিকা প্রস্তুত করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিমাসে নাজমা খাতুনকে মোবাইল খরচ বাবদ ৩০০/- (তিনশত টাকা) দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(২) ব্যাংকে লেনদেনের ক্ষেত্রে সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ -- এ তিনজনের যে কোন দুজনের যুক্ত স্বাক্ষরে টাকা-পয়সা জমা ও উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত কাগজ-পত্রসমূহ জরুরি ভিত্তিতে ব্যাংকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়:

- নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা
- গঠনতন্ত্রের সংশোধনপত্র
- কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ

(৩) পুরাতন কমিটির সদস্যদের নিকট জমাকৃত অর্থসমূহ নতুন কমিটির কোষাধ্যক্ষের কাছে ১৫/০১/২০১২ তারিখের মধ্যে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(৪) আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন খণ্ডকালীন হিসাবরক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(৫) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটির খসড়া বাজেট প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির ৫জন সদস্য-সমন্বয়ে নিম্নোক্ত উপকমিটি গঠন করা হয়:

- জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
- জনাব তরুণ গায়েন
- জনাব মো. জহির উদ্দিন
- জনাব আবুল কালাম আজাদ
- জনাব মোসাম্মৎ নাজমা খাতুন

কাজটি ৩১/০১/১২ তারিখের মধ্যে শেষ করা হবে।

(৬) ২০১২-এর বার্ষিক পরিকল্পনা ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(৭) বার্ষিক প্রতিবেদন ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্ট সোসাইটির ওয়েবসাইটে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৮) বিবিধ বিষয়ে পরবর্তী কার্যকরী কমিটির সভায় আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মনভুবনের প্রতিটি সংখ্যার কমপক্ষে ২০টি করে কপি সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া একুশে বইমেলায় স্টল দেয়া ও সেখানে মনভুবনের কপি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) কার্যনির্বাহী সভার বিবরণী ও সিদ্ধান্ত বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন ব্যাংক একাউন্ট খোলা হবে।

(৩) মো. সাইফুল ইসলামকে সোসাইটির খণ্ডকালীন হিসাবরক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান।

(৪) বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনটি ইংরেজিতে অনুবাদের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সালমা পারভীন এবং তরুণ গায়েন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

(৫) সোসাইটির আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি ফান্ড রেইজিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব আসে যা পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত করা হবে।

(৬) সোসাইটির ফিন্যান্সিয়াল গাইডলাইন চূড়ান্ত করা হবে।

(৭) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার নোটিশ সভা অনুষ্ঠানের একদিন আগেই মোবাইলের খুদে বার্তার মাধ্যমে সদস্যদের জানানো হবে।

৩ এপ্রিল ২০১২

গত ০৩/০৪/২০১২ তারিখে বিসিপিএস-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। সাত (৭) জন সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনাশেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি:

১. বিগত মিটিং-এর আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত অনুগ্রহণ
২. প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম স্মরণে সোসাইটির করণীয়
৩. সোসাইটির আর্থিক হিসাবের হাল অবস্থা
৪. ২০১২ সনের বাজেট এবং তহবিল সংগ্রহ
৫. কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ
৬. অন্যান্য

- সোসাইটির আর্থিক হিসাবের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহার
- ক্লিনিক্যাল রেকর্ড-কিপিং ফরম্যাট
- চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীদের জন্য সরকারি চাকুরি
- 'মনভুবন' বিতরণ
- সোসাইটির নতুন সদস্যদের চিঠি পাঠানো।

সিদ্ধান্তসমূহ:

১. প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগম স্মরণে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়:

- মনভুবনের পরবর্তী সংখ্যার একটি অংশ প্রফেসর রোকেয়া বেগম স্মরণে প্রস্তুত করা হবে।
- প্রতিবছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রফেসর রোকেয়া বেগম স্মরণে 'প্রফেসর রোকেয়া বেগম মেমোরিয়াল লেকচার' -এর আয়োজন করা হবে।
- সোসাইটির ওয়েবসাইটে রোকেয়া বেগমের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি পেইজ রাখা হবে। পেইজটি তৈরির দায়িত্ব নেন কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ জহীরউদ্দিন, তরুণ গায়েন, মোসাম্মাত নাজমা খাতুন, ফারাহ দীবা, কামরুজ্জামান মজুমদার এবং একেএম আজাদ।
- প্রফেসর রোকেয়ার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- প্রফেসর রোকেয়া রচিত বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে কতিপয় রচনা বাছাই করে একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, তরুণ গায়েন, মোসাম্মাত নাজমা খাতুন, সালমা পারভীন, কামরুজ্জামান মজুমদার এবং একেএম আজাদ।
- প্রফেসর রোকেয়ার বিভিন্ন সময়ের ফটোগ্রাফ ও ভিডিও ক্লিপ সোসাইটির আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হবে। এ কাজে নীল, ফারাহ দীবা, ওয়াদুদ মুকুল এবং কামরুজ্জামান মজুমদারের সহযোগিতা চাওয়া হবে।

২. সোসাইটির তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি দাতার কাছে যাওয়া হবে। এ লক্ষ্যে একটি 'প্রোপোজাল' তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সোসাইটির সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-সমন্বয়ে ৩ সদস্যের একটি সাবকমিটি এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে প্রোপোজালটি রচনা করবেন।

৩.সোসাইটি চলতি বছরের ৮-১২ জুন -- এই পাঁচ দিনব্যাপী একটি কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। নির্বাহী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক জোবেদা খাতুন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সহযোগিতায় থাকবেন নির্বাহী কমিটির সদস্য রুমা খন্দকার এবং বিসিপিএস-এর সাধারণ সদস্য সাদিয়া উর্মি।

৪.অন্যান্য:

- সভায় ক্লিনিক্যাল রেকর্ড-কিপিং-এর দুটি ফরম্যাট উত্থাপিত ও পরিমার্জনাসহ গৃহীত হয়। এর মধ্যে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে পূরণ করে বিসিপিএস-এর নির্বাহী কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের দ্বারা 'দেখা হয়েছে' মর্মে সিল ও স্বাক্ষর গ্রহণ করা সকল প্রাকটিশনার চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- মনভুবন-এর প্রকাশিত শেষ সংখ্যার প্রকাশনা খরচ বাবদ বিসিপিএস-এর নির্বাহী কমিটির প্রচার সম্পাদক রুমা খন্দকারকে পঞ্চাশ হাজার টাকার ($৫০,০০০/-) বকেয়া বিল পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে অবস্থিত পত্রিকা স্টলের মাধ্যমে মনভুবন বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ব্যাপারে রুমা খন্দকারকে সহযোগিতা করবেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সিটিটিউট এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে "সহকারী অধ্যাপক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান" নামক পদে সোসাইটির যে দুজন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত রয়েছেন তাদেরকে যেন সেখান হতে অপসারণ করা না হয় সেজন্য সোসাইটি তার সাধ্যমতো সর্বোচ্চ কার্যকর ভূমিকা রাখবে -- এই প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
- সোসাইটির সাধারণ সদস্য ফারজীন হক, ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, নাফিসা বেগম, উর্মি রহমান, ড. এম.এ. রশীদ এবং ড. মুক্তা -- এদের বিভিন্ন অংকের বকেয়া বাৎসরিক সদস্যচাঁদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সদস্যপদ অব্যাহত থাকবে এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। কোষাধ্যক্ষ বকেয়া সদস্যচাঁদা প্রদানের জন্য তাঁদের শেষবারের মতো অবহিত করবেন।

৩ জুলাই ২০১২

গত ০৩/০৭/২০১২ তারিখে বিসিপিএস-এর কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। ৭ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অর্থবহ আলোচনাশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. প্রফেসর ড. রোকেয়া বেগমের স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিষয়টির সমন্বয় করবেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও জনাব রুমা খন্দকার। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে যাদের নাম প্রস্তাব করা হয় তারা হলেন ড. হামিদা আখতার বেগম, জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ড. দিলরুবা বেগম ও ড. পারভীন হক। অক্টোবরের মধ্যেই এটি প্রকাশ করা হবে।
২. ড. রোকেয়া বেগমের প্রকাশনাসমূহ একত্রিত করে বই আকারে বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার মৃত্যুবার্ষিকীর পূর্বে এটি প্রকাশ করা হবে।
৩. ওয়েবসাইটে পাইওনিয়ার ফাউন্ডার হিসেবে ড. রোকেয়া বেগমের নামে একটি লিংক খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৪. বিসিপিএস-এর অর্থনৈতিক কাজকর্ম ডিজিটালাইজড করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৫. কাউন্সেলিং ট্রেনিং-এর তারিখ পিছিয়ে ০২-০৬ অক্টোবর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ট্রেনিং ফি ৮,০০০ টাকা ধার্য করা হয়।
৬. মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মানববন্ধন, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০ অক্টোবর সকাল ১০টায় মানববন্ধন করা হবে। মানববন্ধনশেষে প্রেস কনফারেন্স করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে দুদিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করা হবে।

বিবিধ:

ক. জব-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ফাইলের অগ্রগতি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।
খ. প্রস্তুতি কমিটির সভা সোমবার ০৯-০৭-২০১২ তারিখ বিকেল ৫টায় আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

---

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১২-এর উদযাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনাশেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১. বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১২-এর উদযাপন উপলক্ষ্যে ১০ অক্টোবর সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হবে। উক্ত মানববন্ধনে বিসিপিএস-এর সকল পর্যায়ের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এ বিষয়ে মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন জনাব শাহনুর হোসেন।

২. প্রয়াত প্রফেসর রোকেয়া বেগমকে স্মরণ করে মনভুবন-এর একটি সংখ্যা প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনার মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন জনাব নাজমা খাতুন এবং এ সংখ্যার সম্পাদক হবেন জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী।

৩. ৯-১০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির ক্রীড়া কক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে।

- বিষণ্নতা আত্মহত্যা (ডিপ্রেশন এ্যান্ড সুইসাইড) - সঞ্চালক জোবেদা খানম
- ক্যাম্পাস জীবনে চাপ (স্ট্রেস ইন ক্যাম্পাস লাইফ) - সঞ্চালক নাজমা খাতুন
- কিশোর-কিশোরীদের ক্রাইসিস (এ্যাডোলেসেন্ট ক্রাইসিস) - সঞ্চালক সালমা পারভিন
- অন্তরঙ্গ সম্পর্কে অ্যাবিউজ (অ্যাবিউজ ইন ইন্টিমেট রিলেশনশিপ) - সঞ্চালক তরুণ গায়েন

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য ২০০/- টাকা (১জন) ফিস ধার্য করা হয়েছে। ওয়ার্কশপের দু-তিনদিন আগে দৈনিক প্রথম আলোতে এবিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও ক্যাম্পাসসহ সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে পোস্টার লাগানো এবং ইমেইল ও ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হবে।

৪. বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১২-এর উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত হয়।

- মানববন্ধন - $১৫,০০০/-
- ওয়ার্কশপ - $২২,০০০/-
- মনভুবন - $২০,০০০/-
- অন্যান্য - $৩,০০০/-

৫. বিসিপিএস-এর সকল সদস্যকে আহ্বান করে পরবর্তী মিটিং ২ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়।

---

১৭ নভেম্বর ২০১২

উপস্থিত ছিলেন আটজন সদস্য।

আলোচ্যসূচি:

(১) ৪র্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স

(২) সোসাইটির আর্থিক অবস্থার রিপোর্ট

(৩) বিবিধ: একজন সাধারণ সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) ৯ -১০ ডিসেম্বর ২০১৩ ৪র্থ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কনফারেন্স-এর তারিখ নির্ধারিত হয়। "**Changing Lives through Psychosocial Interventions**" -- শিরোনামে কনফারেন্স-এর থিম নির্ধারিত হয়। ৮ ও ১১ ডিসেম্বর তারিখে কনফারেন্স-পূর্ব ও -পরবর্তী কর্মশালা/ সিম্পোজিয়ামের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

(২) কনফারেন্স-এর প্রচারের জন্য একটি ওয়েব পেইজ তৈরি করা হবে।

(৩) কনফারেন্স-এর সফল অনুষ্ঠানের জন্য কনফারেন্স অরগানাইজিং কমিটি ও সায়েন্টিফিক কমিটি নামে দুটি সাবকমিটি গঠন করা হয়।

২৪ জুলাই ২০১৩

বিসিপিএস-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তরুণ কান্তি গায়েন সভাপতির অনুমতিসাপেক্ষে ৭জন সদস্যকে নিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচিত বিষয়:

১. গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

২. সাভার ট্র্যাজেডিতে দুর্গত ব্যক্তিদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

৩. সদস্যদের বার্ষিক ফি/মেম্বারশিপ

৪. সায়েন্টিফিক কনফারেন্স

৫. ঘ.চ.ট

৬. বিবিধ:

(ক) মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন

(খ) সরকারি চাকুরি
(গ) বিসিপিএস-এর অফিস

সিদ্ধান্তসমূহ:

১. সভায় সর্বসাধারণের সম্মতিক্রমে পূর্ববর্তী কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

২. সাভার ভিকটিমদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কার্যবিধি পর্যালোচনা করা হয়। হার্ব প্রপার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ফান্ড কীভাবে কাজে লাগানো হবে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, Disaster Committtee -তে যারা আছেন (জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার, জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ ও জনাব নাজমা খাতুন) তারা সবাই মিলে এবিষয়ে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য যে, পঙ্গু হাসপাতাল ও সি.আর.পি.-তে ভিকটিম যারা আছেন তাদেরকে নিয়েই মানসিক স্বাস্থ্য সেবার কাজ আপাতত শুরু করা হবে।

৩. মেম্বারশিপের ফিস সংক্রান্ত বিষয় আপডেট করে সবাইকে নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে যেসব মেম্বারদের চাঁদা বাকি আছে তাদের বিষয়টি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া হয় জনাব জোবেদা খাতুনকে। ওয়েবসাইটে মেম্বারশিপ আইডিসহ একটি তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪. বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাসাপেক্ষে সায়েন্টিফিক কনফারেন্স ২৭-২৮ ফেরুয়ারি ২০১৪-তে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কনফারেন্সের পূর্ববর্তী দিন ২৬ ফেব্র "য়ারি ও পরবর্তী দিন ১ মার্চ দুটি করে ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হবে।

বিবিধ:

(ক) মানসিক স্বাস্থ্য দিবসকে উপলক্ষ্য করে কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর মধ্যে ১টি র‍্যালি, ৪টি আধাবেলা ও ২টি সারাদিনব্যাপী ওয়ার্কশপের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া মনোভূবন-এর জন্য সম্পাদক হিসেবে জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও তার সহযোগী হিসেবে জনাব শাহনূর হোসেনকে মনোনীত করা হয়।

(খ) অতি শীঘ্র বিসিপিএস-এর কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি অফিস ভাড়া নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে মূল ফান্ড থেকে ৮০,০০০/- টাকা, ২টি কাউন্সেলিং ট্রেনিং ও বার্ষিক ফিস থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই খাতে ব্যয় করা হবে।

(গ) সরকারি পদ সৃষ্টির ব্যাপারে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আলোচনা করা হয়।

(ঘ) অ.এ.গ. এর তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ গৃহীত হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩

আলোচ্যসূচি:

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৩ উদযাপন

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। জোবেদা খাতুন র‍্যালি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড কো-অর্ডিনেট করবেন

(২) ১ ও ২ নভেম্বর ৬টি বিষয়ের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে: রাগ নিয়ন্ত্রণ;পজিটিভ প্যারেন্টিং; ট্রমা-পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্যসেবা; ইন্টারনেট আসক্তি; অন্তরঙ্গ সম্পর্কে নির্যাতন; উদ্বেগ প্রশমন এবং বয়োঃবৃদ্ধকাল। জোহরা পারভীন বাণী কর্মশালাগুলোর কোর্ডিনেটর-এর দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির বিভিন্ন ইস্যু ও সেবাভিত্তিক কতিপয় স্টলও রাখা হবে।

৩, ৬, ৮ ও ১০ অক্টোবর ২০১৩

আলোচ্যসূচি:

দেশে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৩ উদযাপন।

সিদ্ধান্ত:

অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে শুধুমাত্র ১০ অক্টোবর-এ র‍্যালি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয় এবং বাকি সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

০১ নভেম্বর ২০১৩

আলোচ্যসূচি:

(১) চতুর্থ বাংলাদেশ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান সায়েন্টিফিক কনফারেন্স
(২) বিসিপিএস-এর বার্ষিক সাধারণ সভা
(৩) অন্যান্য

উপস্থিতি:

সদস্য - ৬জন
পর্যবেক্ষক - প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমান ও ড. কামরুজ্জামান মজুমদার

সিদ্ধান্তসমূহ:

(১) সায়েন্টিফিক কনফারেন্স

১.কনফারেন্স তারিখ

১৪-১৭ আগস্ট ২০১৪ (সায়েন্টিফিক সেশন - ১৫ ও ১৬ আগস্ট; প্রাক ও পরবর্তী সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি - ১৪ ও ১৭ আগস্ট)

২.স্থান

উদ্বোধনী সভা - নতুন সিনেট ভবন (হল রুম);
সায়েন্টিফিক সেশন - নতুন সিনেট ভবন (কনফারেন্স রুম) ও পুরনো সিনেট ভবন

৩.কনফারেন্স সংগঠন কমিটি

আহ্বায়ক: তরুণ কান্তি গায়েন, সাধারণ সম্পাদক, বিসিপিএস;
সমন্বয়কারী: কামরুজ্জামান মজুমদার, সহকারী অধ্যাপক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাবি

৪.সায়েন্টিফিক কমিটি

আহ্বায়ক: প্রফেসর ড. মাহমুদুর রহমান;
সদস্য: প্রফেসর হামিদা বেগম, ড. গ্রাহাম পাওয়েল, কামাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরি, ড. কামরুজ্জামান মজুমদার, নাজমা খাতুন, মো. জহীর উদ্দীন ও শাহনুর হোসেন

৫.তহবিল সংগঠন কমিটি

কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, তরুণ কান্তি গায়েন, এসএম আবুল কালাম আজাদ, সালমা পারভীন ও ইসরাত শারমীন

৬.রেজিস্ট্রেশন ফি

- বিদেশি - $১৫০ (সমাপ্তি নৈশভোজসহ সব অনুষ্ঠান);
- সার্ক দেশসমূহের অতিথি - $১০০ (সমাপ্তি নৈশভোজসহ সব অনুষ্ঠান);
- বিসিপিএস সদস্য - $৩,০০০ (সমাপ্তি নৈশভোজসহ সব অনুষ্ঠান);
- ঢাবি চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রশিক্ষণার্থী - $১,৫০০ (সমাপ্তি নৈশভোজসহ সব অনুষ্ঠান);
- যে কোনো বিভাগের ছাত্র/ছাত্রী - $১,৫০০ (১৫ ও ১৬ আগস্টের সায়েন্টিফিক সেশনসমূহ);
- যে কোনো বাংলাদেশি - $৩,০০০ (সমাপ্তি নৈশভোজসহ ১৫ ও ১৬ আগস্টের সায়েন্টিফিক সেশনসমূহ);
- যে কোনো বাংলাদেশি - $২,০০০ (১৫ ও ১৬ আগস্টের সায়েন্টিফিক সেশনসমূহ)

৭.ঘোষণা/প্রজ্ঞাপন

কনফারেন্সের তারিখ ও অন্যান্য তথ্য প্রচারের জন্য একটি ওয়েব পেইজ তৈরি করে বিসিপিএস-এর ওয়েবসাইট-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ওয়েব পেইজটির আধেয় যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিয়েছেন ড. কামরুজ্জামান মজুমদার।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভা

১. তারিখ ও স্থান

২৭ ডিসেম্বর ২০১৩; সিনেট ভবন/ আরসি মজুমদার কনফারেন্স হল/ উচ্চতর মানব বিদ্যা বিভাগ কনফারেন্স হল

২. কর্মসূচি

২.ক. সেসন ১ (৯টা থেকে ১২টা): সকল সদস্যদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর প্রেজেন্টেশান-

- বিসিপিএস-এর গত দুবছরের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিবেদন
- বিসিপিএস-এর কৌশলগত পরিকল্পনার পর্যালোচনা
- চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানিদের সরকারি চাকরি
- বিসিপিএস-এর লোগো

২.খ. সেসন ২ (১.৩০টা থেকে ৫টা): বার্ষিক সাধারণ সভা (কেবল মাত্র বিসিপিএস সদস্যদের জন্য)

৩. বিসিপিএস কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন

- মনোনয়ন পত্র পাওয়া যাবে বিসিপিএস ওয়েবসাইট ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে - ১০ ডিসেম্বর ২০১৩;
- মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ - ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩;
- মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ - ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩;
- মনোনয়ন পত্র বাছাই ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা - ২২ ডিসেম্বর ২০১৩;
- নির্বাচন - ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩

৪. নির্বাচন কমিশনার

কাজি সাইফুদ্দিন, চেয়ারম্যান, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

৫. যত দ্রুত সম্ভব একটি আপডেটেড সদস্যতালিকা প্রস্তুত করে বিসিপিএস ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।

৬. বার্ষিক সাধারণ সভার ১৫ দিন আগে সব সদস্যদের কাছে সভার প্রজ্ঞাপন পত্র পাঠানো হবে।

৭. নির্বাচনে প্রার্থী হতে বা প্রার্থী মনোনয়ন করতে হলে সব চাঁদা/প্রদেয় প্রদান করতে হবে। যোগাযোগ করুন - এসএম আবুল কালাম আজাদ অথবা জোবেদা খাতুন।

১১ ডিসেম্বর ২০১৩

সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রস্তাবিত জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন-এ মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবিদের তালিকায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এম.এস. ডিগ্রিধারীদের 'সাইকোলজিস্ট (ক্লিনিক্যাল)' নামে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় সচিব, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট-এর ডিরেক্টর মহোদয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির নিকট লিখিত অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। একাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তরুণ গায়েন এবং প্রফেসর মাহমুদুর রহমান।

২১ জানুয়ারি ২০১৪

বিসিপিএস-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তরুণ কান্তি গায়েন সভাপতির অনুমতিসাপেক্ষে ৭জন সদস্যকে নিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচিত বিষয়:

১. বিসিপিএস-এর সদস্যতালিকা আপডেট করা
২. বার্ষিক সদস্য ফি প্রদান
৩. এজিএম-এর তারিখ ও শিডিউল নির্ধারণ
৪. বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে পরবর্তী সম্ভাব্য কার্যনির্বাহী কমিটির প্যানেল প্রস্তাব
৫. বিসিপিএস-এর গঠনতন্ত্র সংশোধন
৬. বিবিধ

সিদ্ধান্তসমূহ:

১. বিসিপিএস-এর সদস্যতালিকা আপডেট করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে সদস্যবৃন্দের নাম, ঠিকানা, ইমেইল ও মেম্বারশিপ আইডিসহ তালিকাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করা হয় জনাব জোবেদা খাতুনকে।

২. সদস্যদের বার্ষিক ফি সংক্রান্ত বিষয়ে এজিএম-এর আগে সবাইকে আবারও নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অসামান্য কর্ম ও অবদানের কথা বিবেচনা করে ড. আনিসুর রহমান, ড. হামিদা আক্তার বেগম, ড. পারভীন হক ও ড. সুলতানা বানুকে আজীবন সদস্য করার প্রস্তাব করা হয়। সভাপতি জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ সবার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করবেন।
৩. এজিএম-এর তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ নির্ধারণ করা হয়। বাজেট সংকুলান হলে এ প্রোগ্রামটি সিনেট ভবনে, অন্যথায় উচ্চতর মানব বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজিএম-এর শিডিউল হবে নিম্নরূপ:

- কোয়ালিটি অব সুপারভিশন বিষয়ে ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করবেন জনাব নাজমা খাতুন
- বিসিপিএস-এর লোগো পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করবেন জনাব কামরুজ্জামান মজুমদার
- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
- কোষাধ্যক্ষর দ্বিবার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রকাশ

৪. বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেল প্রস্তাব করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে আরো দুটি সদস্যপদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়।
৫. ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের মধ্যে গঠনতন্ত্র সংশোধনের কোন প্রস্তাব থাকলে সে বিষয়ে চিঠি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, দুটি সদস্যপদ বাড়ানোর প্রস্তাবে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া অ্যাসিসট্যান্ট ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট-এর পরিবর্তে সাইকোলজিস্ট (ক্লিনিক্যাল) নাম পরিবর্তনের বিষয়েও গঠনতন্ত্রে সংশোধনের আবশ্যিকতা রয়েছে।
৬. ড. রোকেয়া বেগমের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ১১ ফেব্রুয়ারি আর.সি. মজুমদার হলে "রোকেয়া বেগম মেমোরিয়াল লেকচার" আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৭. বিবিধ:

- অনেকে বিসিপিএস-এর সদস্য পরিচয়ের অপব্যবহার করছে বলে অভিযোগ ওঠে। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়।
- ১৭তম ব্যাচের ১৪ জন ছাত্র- ছাত্রীকে ট্রেইনি মেম্বার হিসাবে অনুমোদন দেয়া হয়।
- স্ট্রাটিজিক প্ল্যানিং নিয়ে আলোচনা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকাল ৩টায় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- বিসিপিএস-এর কাজের সুবিধার্থে একটি বিকাশ একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সোসাইটির সীমাবদ্ধতা:

১. বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটিকে তার অধিকাংশ কর্মসূচি পরিচালনা করতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ট্রেইনিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে সোসাইটির সাধারণ সদস্যগণের অংশগ্রহণ এখনও পর্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক নয়।
২. সোসাইটি এখনও পর্যন্ত রেজিস্টার্ড না হওয়ার কারণে এর আইনি ভিত্তি দুর্বল রয়ে গেছে।
৩. সোসাইটির নিজস্ব সেক্রেটারিয়েট না থাকার কারণে রেকর্ডকিপিংসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়।
৪. সোসাইটি তার স্ট্রাটেজিক প্ল্যান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এর কর্মকাণ্ড অনেকক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়ামূলক (রিএ্যাকটিভ), প্রোএ্যাকটিভ নয়। অনেক জাতীয় ইস্যুতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতেও ব্যর্থ হচ্ছে।
৫. অন্যান্য অ্যালাইড হেলথ প্রোফেশনালদের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট উষ্ণ নয় - এ ব্যাপারে যথাযথ নীতি ও কৌশল প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে।
৬. সোসাইটির তহবিলে নগদ অর্থ খুবই কম।
৭. সাধারণ সদস্যদের ওপরে সোসাইটির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কম।

সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে -- এই প্রত্যাশায় ধন্যবাদসহ,

তরুণ কান্তি গায়েন
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি

৭ মার্চ ২০১৪

সিজোফ্রেনিয়াঃ মুক্তি বহুমূখী চিকিৎসায়

মোঃ জহির উদ্দিন
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট
এসিসটেন্ট প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

সিজোফ্রেনিয়াকে একসময় বলা হতো সাইকিয়াট্রির ক্যান্সার। বলা হতো- এটি আর ভাল হয়না এমন বিশ্বাস এখনো বহুল প্রচলিত। যার সিজোফ্রেনিয়া হয় তার আচার-আচরণ হয় অদ্ভূত। সে এমন সব আচরণ করে যা কল্পনাও করা যায়না। একজন রোগীকে একবার খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। অনেক ডাকা ডাকির পর তাল গাছের উপর থেকে তার সাড়া মিললো। ব্যাপর এই- গরম লাগছিল। গ্রামের বাড়ি। বিদ্যুৎ নেই। তাই তাল গাছের মাথায়। বেশ বাতাস লাগছিল। রাতি বারটার উপর। গ্রামের বাড়ি। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। এক রোগীকে একবার দেখলাম মহা আনন্দে ড্রেনের পানি পান করছি। তার চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম সে হয়তো ড্রেনটাকে ঝরনা বা এধরণের কোন পানির উৎস ভেবেছে। এক রোগীকে আত্মীয়-স্বজন একটা বিবাহই দিয়ে দিল। বউ এসে রোগীর দেখা শোনা করবে। সকালে ওকে আর খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। কি বিষয়? পরে পাওয়া গেল মাচার উপর। রোগীর সাফ উত্তর। অনেক দিন মাটির উপর হাটাহাটি করেছি। এখন ধরনা, মাচা এগুলোতে কিছু দিন থেকে দেখি কি হয়। সিজোফ্রেনিক রোগীর মেজাজ-মর্জি অনেক সময় বেশ খারাপ থাকে। খামোখাই খেপে যায়। আসলে রোগীর মাথা বোঝাই থাকে নানা ধরণের ভুল ধারণা। একজন রোগীর ধারণা কেউ যদি পায়ের উপর পা তুলে বসে পা দোলায় তার মানে সে রোগীকে ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার সাথে খারাপ কাজ করতে চাচ্ছে। কত বড় আস্পর্ধা! তাকে গিয়ে সোজা মার শুরু করে দিল। আরেক রোগী বিশ্বাস করতো যে তার পিছনে পুলিশ লেগে গেছে। তার প্রেমিকা তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। ভয়ে সে আর বাঁচেনা। এক জায়গায় দুই রাত্রি থাকার সাহসও তার নেই। কতদিন আর ফেরারী হয়ে থাকা যায়? কি কষ্ট! ছার্জেন্ট হয়তো ওয়্যারলেসে কারো সাথে কথা বলে হাটছেন। এটার মানে তিনি এই রোগীর বিষয়ে কাউকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনেক সময় রোগীর ভাষায় গোলমাল লাগে। তার কথাবার্তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়না। অনেক রোগী নিজের যত্ন নিজে নিতে পারেনা। বার বার না বললে নিজের নখ কাটেনা, দাঁত মাজেনা, গোসল করেনা। সারা গায়ে দূর্গন্ধ। এক জায়গায় চুপ-চাপ বসে বা শুয়ে থাকে। কথাও বলেনা। কোন কাজ করেনা। চাকুরী করেনা, লেখাপড়া করেনা। একা একা কথা বলে। বিড় বিড় করতেই থাকে। যেন কারো কথা শুনতে পাচ্ছে। তার কথার উত্তর দেয়। কিন্তু অন্য কেউ তার কথা শুনছেও না, কিছু দেখছেওনা। রোগী নিজেই একা একা শুনে। রোগী কোন কারণ ছাড়াই তার স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে গুরুতর সন্দেহ করে ও সাংঘাতিক ভাবে তদন্ত শুরু করে। ধরে মারপিটও করে ফেলে। আসলে কিন্তু কিছুইনা। রোগী বলে তার খাবারে বিষ বা খারাপ কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। না খেয়ে না খেয়ে তার শরীর দড়ির মতো হয়ে যায়। এক রোগী দীর্ঘদিন না খেয়ে না খেয়ে শেষে অপুষ্টিতে মরে গেল। এক রোগী নিজেকে সৃষ্টিকর্তার দূত মনে করতো। এক রোগী বিশ্বাস করতো আসলে তার বাবার রুপ ধরে শয়তান ঘোরাফেরা করছে। তাই সে একদিন বাবাকে কুপিয়ে মেরেও ফেললো। পুলিশ এসে এই রোগীকে ধরে নিয়ে গেল। কত বিচিত্র লক্ষণ হতে পারে সিজোফ্রেনিয়ার- তা বলে আর শেষ করা যায়না। তবে সবার মধ্যে সব লক্ষণ কিন্তু থাকেনা। মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিষ্টেরা সিজোফ্রেনিয়ার রোগ নির্ণয় করে থাকেন।

বাংলাদেশে কি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আছে। উত্তর হলো আছে। দেশব্যাপী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, দেশে শতকরা ০.৬ ভাগ পূর্ণবয়সী মানুষের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া বা এধরণের গুরুতর মানসিক রোগ আছে। যদি ষোল কোটী মানুষের মধ্যেই এই হারে এই রোগ আছে ধরে নিয়ে হিসাব করি তবে দেশে মোটামুটি ভাবে ষোল লাখ ষাট হাজার সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আছে। এই সংখ্যা কিন্তু অবহেলা করার মতো নয়।

বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার পুরো বিষয়টা খুব ভাল ভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা। যতটুকু চিৎিসা আছে তা শুধু ঔষধের প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাও ঠিকমতো হচ্ছেনা। এখনো কবিরাজ-পীর-ফকিরের, তাবিজ-কবোজ ও ওঝার খপ্পর থেকে এই চিকিৎসা ডাক্তারের হাতেই আসেনি ঠিকমতো। অনেকে বোঝেইনা যে এটি একটি রোগ। অনেকে জানেনা কোথায় চিকিৎসা পাওয়া যায়। মানসিক রোগের যে ডাক্তার আছে, তাদের যে সাইকিয়াট্রিষ্ট আছে তাই জানা নেই বেশীর ভাগ মানুষের। যারা জানে তারাও ভুল ভাবে জানে। ভাবে সাইকিয়াট্রিষ্টের ঔষধ খেলে মানুষ আরো পাগল হয়ে যাবে। ফল হলো সিজোফ্রেনিক রোগীর সাংঘাতিক দূর্ভোগ। তারা মার খায়, নির্যাতিত হয়। তাদেও বিনা চিকিৎসায় শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয় পশুর মতো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। চিকিৎসা আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই।

বাংলাদেশে মানসিক রোগের ডাক্তারেরা অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার করে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। মুস্কিল হলো এই ঔষধগুলোর অনেক ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। রোগী চোখে ঝাপসা দেখে, তার শরীর কাঁপে, তার গলা শুকিয়ে আসে, পায়খানা কশা হয়ে যায়, অনেকে মোটা হয়ে যায়। সারাক্ষণ নেশাখোরের মতো ঘুম ঘুম লাগে। তাই রোগীরা এই ঔষধগুলো খেতে চায়না। প্রায়ই ছেড়ে দেয়। এছাড়া ঔষধ যে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে তা রোগী বা তার পরিবার বুঝতেও পারেনা, মনে হয় বুঝতে চায়ওনা। ঔষধ খাব, রোগ ভাল হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ দুই এক সপ্তাহ ঔষধ খাব। তার বেশী আর কি দরকার- এমনটা চিন্তা। এছাড়া মানুষ গরীব। এই রোগের ঔষধ বেশ ব্যায়স্বাপেক্ষ। কেউ ঔষধ খেতে দেখে বুঝে ফেললে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত পাগল বলে কটাক্ষ করবে। সিজোফ্রেনিয়া হলে রোগী বুঝতে পারেনা যে তার কোন রোগ হয়েছে। তার লক্ষণগুলোকে সে বাস্তব মনে করে। এক রোগী অভিভবাকদের আউটডোরের ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে রেখে ডাক্তারকে একান্তে জানালো যে আসল পাগল হলো তার বাবা-মা। সে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন ডাক্তার সাহেব একটু কড়া ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা দিলেই হয়। এরকম জ্ঞান থাকলে রোগী ঔষধ খেতে চাইবার কথা নয়। তার খেতে চায়ও না। সব মিলিয়ে ঔষধ নিয়মিত খাওয়া হয়না। ফলে বার বার অসুখের লক্ষণ বেড়ে গিয়ে মহা অশান্তি হয়।

ভাল ভাবে ঔষধ ব্যবাহর করলে ও অন্যান্য চিকিৎসা নিলে কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো অনেক কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, শতকরা এক তৃতীয়াংশ রোগী ঔষধের মাধ্যমে একদম ভাল হয়ে যায়। বাকি এক তৃতীয়াংশ ঔষধ সহ ভাল থাকে। স্বাভাবিক জীবন-যাপন চালিয়ে নিতে পারে। বাকি এক তৃতীয়াংশের অসুখ ততটা ভাল হয়না।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নত বিশ্বে ঔষধের পাশাপাশি আরো নানা প্রকার চিকিৎসা ব্যবহৃত হচ্ছে। মানসিক রোগীরা দিনের পর দিন কোন কাজ করেনা। তাদের নিজের যত্ন নেবার ক্ষমতা নেই। তারা চিত্তবিনোদন করেনা। তারা সারা দিনে সময় কাটানোর কিছু পায়না। কিছুই করেনা। ফলে তৈরী হয় ডিজঅ্যাবিলিটি। সে কিছু করতে ভুলে যায়। সিজোফ্রেনিয়া অল্পবয়সে হলে ক্ষতি হয় সবথেকে পেশী। রোগীরা কোন পেশায় কাজ করতে পারেনা। অকুপেশনাল থেরপিষ্ট বলে একধরণের পেশাজীবী আছেন যারা এক্ষেত্রে রোগীদের সাহায্য করতে পারেন। বাংলাদেশে সাভারের চাপাইনে সিআরপি বলে একটি প্রতিষ্ঠান হতে অকুপেশনাল থেরাপির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অকুপেশনাল থেরাপিষ্টরা সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে বহুসংখ্যক অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট আছে। আমি দক্ষিণ ভারতের একটি অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট দেখেছি। আমাদের দেশেও এর বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এগুলো হলে রোগীদের জীবনের গুণগত মানে পরিবর্তনত আসতো।

অনেক রোগী আছেন যারা চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফেরার পর আর আসেনা। কেমন আছে তারা? তারা কি ঔষধ খাচ্ছে? তাদের পরিবারের পরিবেশটাই বা কেমন? তাদের সামাজিক জীবনটা কি ঠিক আছে? না তারা গুটিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আটকে আছে নিজস্ব অদ্ভূত কল্পনার মধ্যে। দরজা- জানালা আটকে আধার ঘরে কাটাচ্ছে বছরের পর বছর। কে তাদের খবর নিবে? তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনের দাওয়াত দিবে? বিদেশে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা এই কাজটি করে থাকেন। গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় ক্লিনিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক নামে একটি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। হয়তো এই সমাজকর্মীরা একদিন রোগীদের দুঃখ ঘোঁচাবে।

অনেক মানসিক রোগী আছেন যারা বড় মানসিক হাসপতাল বা মেডিকেল কলেজ থেকে দূরে বসবাস করে। তাদের পক্ষে এত দূর থেকে এসে নিয়মিত চিকিৎসা নেয়া সম্ভবনা। এজন্য উন্নত বিশ্বে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার পর্যায়েই তাদের চিকিৎসা সেবা দেয় হয়। দেন সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারেরা। অনেক দেশে প্রশিক্ষিত নার্সরা পর্যন্ত সিজোফ্রেনিক রোগীদের ঔষধের ফলোআপ করেন। জটিল কেসগুলো তারা ডাক্তারের কাছে পাঠান। সেগুলো আবার লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে নার্সদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। শুনলে অবাক লাগে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাদের দেশেতো ডাক্তার আছে প্রচুর। তবুও তারা মানসিক রোগের ডাক্তার দিয়ে সব রোগীকে সেবা দিতে পারেনা। আমাদের দেশের অবস্থা আরো খারাপ। দেশের মানসিক রোগের ডাক্তর মোটে ১১৫ জন। মানুষ ষোল কোটী। কি একটা অবস্থা! বিদেশী মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে। কাজ চলছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের সাথে মানসিক রোগর চিকিৎসা ইন্টিগ্রেটেড করার। হেলথ কম্পেলেক্সের এমবিবিএস ডাক্তারেরাই সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিবেন। তাদের এত দূর এসে চিকিৎসা নিতে হবেনা। সরকারের এসেন্সিয়াল ড্রাগ লিষ্টে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ সহ বেশ কয়েক ধরণের মানসিক রোগের ঔষধ অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রকিয়াটি বাস্তবায়িত হলে অনেক রোগী উপকার পাবে। চিকিৎসা বাদ দেয়ার প্রবণতা কমে যাবে অনেকটা। তবে মক্কা বহু দূর। এখনো এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লাগবে। তবে আশার কথা কাজ চলছে। এক দিন না এক দিন হবেই।

উন্নতবিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় আর্ট থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় এর সফলতা পাওয়া গেছে। আর্ট থেরপির কৌশল হিসাবে ছবি আঁকা, গান ও ছন্দ এবং নৃত্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর্ট থেরাপির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। আমার জানামতে প্রশিক্ষিত আর্ট থেরাপিষ্ট নেই একজনও।

উন্নতবিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় সাইকোলজিক্যাল থেরাপি বা সাইকোথেরাপির প্রয়োগ ব্যাপক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক্ষেত্রে 'কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি' বিশেষ ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরণের চিকিৎসায় রোগীন ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত পরোক্ষ ভাবে পরিবর্তন করে তার রোগের লক্ষণ গুলোকে কমানো হয়। এছাড়া আচরণের মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়। ফলে রোগী তার রোগ থাকা সত্বেও জীবন-পথে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায়। তার জীবনের গুণগত মানে উন্নতি ঘটে। তার ডিজঅ্যাবিলিটি বা পরনির্ভরশীলতা কমে অনকখানি। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা 'কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি বা সিবিটি' দিয়ে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পড়ানো হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র তেতাল্লিশ জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট তৈরী হয়েছে। এদের একটি অংশ আবার দেশের বাইরে চলে গেছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা অনক ধরণের সাইকোথেরাপি দিয়ে থাকেন।

কথায় বলে- 'পাগলে কি না বলে' । তাই সিজোফ্রেনিক রোগীও যে মানুষ- তা আমরা ভুলে যাই। তার মনে কথার পাহাড়। কত অদ্ভূত কথা মনে ঘুরে বেড়ায়। কেউ শুনেনা। কত প্রশ্ন মনের মধ্যে। কে দেবে উত্তর। ঔষধের পাশাপাশি এই রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোন দরকার। একে বলে সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং। মাসে দ্ইু - একবার অন্তত: এক ঘন্টার জন্য বসা দরকার।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের সবার সমান অবস্থা হয়না। অনেকের সাথে কথা বলা চলে। তাদেরকে তাদের মতো করে সহজ ভাষায় তাদের রোগটি কি, এর চিকিৎসাই বা কি তা ভাল করে বোঝানো দরকার। একে বলে সাইকোএডুকেশন। রোগীর পরিবারের সদস্যদেরকে বিশেষভাবে রোগীর মূল যতœগ্রহণকারী সদস্যদেরকে রোগটি কি, লক্ষণ কি, অতিরিক্ত রাগ হলে কি করতে হবে, ঔষধ কেন দেয়া দরকার, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি, কিভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কি ধরণের পারিবারিক পরিবেশ রোগীর জন্য ভাল, রোগীর সামাজিক জীবন কিভাবে বাড়াতে হবে, তার যতœগ্রহণ করতে হবে কিভাবে, কিভাবে তাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে, তার পেশাগত কাজে কিভাবে তাকে যুক্ত করা যায়, রোগটি বংশে ছড়ায় কিনা, রোগীর বিবাহ দেয়া দরকার কিনা, দিতে হলে কি কি সতর্কতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা হয় সাইকোএডুকেশনে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, অর্থাৎ একজন অভিভাবকের সাথে একজন সাইকোলজিষ্ট বসে সাইকোএডুকেশন দিয়ে এর অনেকগুলো ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। এতে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ কমেছিল, তাদের সিজোফ্রেনিয়া বিষয়ক জ্ঞান বেড়েছিল এবং পুরো বিষয়টি রোগীর যত্ন গ্রহণে ভাল প্রভাব ফেলেছিল। পৃথিবীর অনেক দেশে রোগীর পরিবারের সদস্যদের গ্রুপে সাইকোএডুকেশন দেয়া হয়। ্আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের মূল যত্ন গ্রহণকারীদের আমরা রোগী ভর্তিকালীন সময়ে সপ্তাহে একটি করে মাসে তিনটি সাইকোএডুকেশন দিয়ে ভাল ফল পেয়েছি। তবে এটি গবেষণা ছিলনা। রোগীর অভিভাবকেরা বাচনিক ভাবে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আমার বিবেচনা মতে এতে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান বেড়েছিল, তাদের মানসিক চাপ কমেছিল, এবং তারা রোগীর যত্ন গ্রহণে আরো পারদর্শী হয়ে উঠেছিল যা রোগীদের পুনঃপুনঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে বলে আশা করছি।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের আত্মীয় পরিজনদের অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক। কোন কোন রোগীর নিবীড় পরিচর্যা লাগে। কারো কারো রাগ বেশী। মেয়ে সিজোফ্রেনিয়া রোগী হলে আরো আতঙ্ক। এই রোগীরা অনেকে লক্ষ্য না করলে একদিকে হাটা দেয়। কোথায় যাচ্ছে তা বলতেও পারেনা। অনেকে নিজের নাম, বাবা-মার নাম, ঠিকানা কিছু বলতে পারেনা। কাজেই মেয়ে রোগী যাতে কোন বিপদে না পড়ে তার জন্য পরিবার-পরিজন তটস্থ থাকে। বেশ কিছু গবেষণায় রোগীর যত্ন গ্রহণকারীদের মনের চাপ অনেক বেশী বলে পাওয়া গেছে। আমার নিজের একটি গবেষণায় এই প্রাথমিক যতœগ্রহণকারীদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপরের মানসিক চাপ এত বেশী পাওয়া গিয়েছিল যে, তা মানসিক রোগীদের সমতূল্য। বাংলাদেশে এই পরিবার-পরিজন, যারয চব্বিশ ঘন্টা একটা অদ্ভূত চাপপূর্ণ পরিবেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সেবা করছে তাদের চিকিৎসা বা মানসিক সমর্থন দেয়ার মতো ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। যে নিজেই পাগল হবার মতো অবস্থায় আছে, সে রোগীর সেবাও ভাল ভাবে বরতে পারবেনা। এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়া বিশেষ জরুরী। যতদিন কোন ভাল ব্যবস্থা গড়ে না উঠছে ততদিন পরিবারের তরফ থেকেই কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। নিয়ম হলো সিজোফ্রেনিয়ার পরিচর্যাকারী যাতে সপ্তাহে অন্তত: একদিন এই দায়ীত্ব থেকে অব্যাহতি পায় এবং প্রতিদিনও তার যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর চিকিৎসা ভাল ভাবে করতে হবে। তাহলে সে যত্ন গ্রহণকারীকে ততটা জ্বালাবেনা।

উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের চিকিৎসার জন্য ‘হেলিউসিনেশন গ্রুপ বা গায়েবী আওয়াজ গ্রুপ’ পরিচালনা করা হয়। যে সিজোফ্রেনিক রোগীদের ‘হেলিউসিনেশন’ বিশেষতঃ ‘অডিটরি হেলিউসিনেশন’ হয় তারা একটি ছোট দলে বসে একজন থেরপিষ্ট/ সাইকোলজিষ্টের তত্বাবধানে কেন তারা এভাবে কানে ভুল শুনছেন, কেউ শুনছেনা, অথচ তারা কেন শুনছেন তার একটা ব্যাখ্যা খুজতে চেষ্টা করেন। তারা এই ‘গায়েবী আওয়াজের’ সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখেন। রোগীরা সাধারণতঃ গায়েবী আওয়াজের স্বাপেক্ষে একধরণের প্রতিক্রিয়া করতে থাকেন। ফলে মানুষ দেখে তারা বিড় বিড় করে কার সাথে যেন কথা বলছেন। মানুষ বুঝে যে এই লোকটি একজন মানসিক রোগী। যদি রোগী এটা বন্ধ করতে পারে, যদি গায়েবী আওয়াজের কথাগুলোকে তারা পাত্তা না দেয় তবে তারা জীবনে আরো ভাল ভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন। এই রোগীরা নিবীড় ভাবে রিল্যাক্সেশন ব্যায়াম শিখেন। রিল্যাক্সেশন পেশীর ব্যায়ামের সাহায্যে, কল্পনার সাহায্যে ও নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস চর্চার সাহায্যে করা যায়। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা অত্যন্ত খারাপ ভাবে উৎকন্ঠায় ভুগে থাকেন। গভীর ভাবে রিল্যাক্সেশন করাতে পারলে তারা কিছুটা শান্তি পায়। রোগীরা তাদের নিজেদের দুঃখের কথা বলে ও একে অপরকে মানসিক সমর্থন জুগিয়ে মনে একধরণের শান্তি পান। তারা গায়েবী আওয়াজকে সহজভাবে নেন, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনে বা মানুষের সাথে গল্প করে তাদের গায়েবী আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করেন। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের নিয়ে আমরা কয়েক মাস ধরে এধরণের গ্রুপ পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলাম। ফল ততটা সুখকর হয়নি। রোগীরা এত বেশী মানসিক চাপ ও কষ্টে থাকে, এত অস্থির ও অমনোযোগী থাকে যে তাদের রিল্যাক্সেশন করাতে বা গ্রুপে কথা বলাতে প্রায় রোগী প্রতি একজন করে সাইকোলজিষ্ট বা ডাক্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই গ্রুপ গুলো আমরা করতেও পেরেছি স্বল্প সময়ের জন্য। একঘনন্টা বসিয়ে রাখা ছিল দুঃস্বাধ্য। গ্রুপগুলো সপ্তাহে একবার করে ত্রিশ মিনিটের জন্য করা গেছে। ভর্তি রোগী হওয়ায় ওয়ার্ডের মধ্যে গ্রুপ পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অন্যান্য ভর্তি রোগীরা ভীর করে দাঁড়িয়ে গ্রুপের পরিবেশ বিঘ্নিত করতো। গ্রুপের জন্য আমাদের রোগী বাছাইতেও কিছুটা সমস্যা ছিল। আরেকটু কম লক্ষণযুক্ত রোগী নিলেই বোধ হয় ভাল হতো। যাহোক, যতটুকু করা গেছে তাতেও কিন্তু রোগীরা কিছুটা উপকৃত হয়েছে। সারাদিনে এই দুঃখী মানুষগুলো ওয়ার্ডে বসে বসে থাকে। করার নেই কিছু। গ্রুপে থাকাকালে তবুও একটু পরিবর্তন হয় পরিবেশের। তাছাড়া রিল্যাক্সেশন ও আবেগের প্রকাশ ও গায়েবী আওয়াজের সাথে খাপ খাওয়াতে শিখানোর মাধ্যমে রোগীর বেশ কিছুটা উপকারও হয়েছিল। এই ধরণের দল পরিচালনা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের জন্য এমন ধরণের চিকিৎসা সুযোগ গুলোর ব্যবস্থা করা বিশেষ ভাবে দরকার।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা সামাজিক দক্ষতা ভুলে যায়। যেসব রোগী চিকিৎসায় কিছুটা উন্নত হয়েছে তাদেরকে দলীয় পরিবেশে সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। ফলে তারা সমাজে ফলপ্রসুভাবে মিশতে পারবে। বাংলাদেশে আমরা মানসিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দলে এটি দেয়া হয়। একটি প্রশিক্ষণ মডিউল অনুসরণ করে মোটামুটি বার থেকে পনের সপ্তাহে এটি দেয়া হয়। সপ্তাহে একটি করে প্রশিক্ষণ গ্রুপ করা হয়- দুই ঘন্টা করে গ্রুপ চালাতে হয়। সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপে তিনজন মনোবিজ্ঞানী থাকা দরকার। তাদেরকে অভিনয়েও কিছুটা দক্ষতা হতে হয় যাতে তারা রোল প্লে করে করে শেখাতে পারে। এধরণের গ্রুপ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে, ঢাকাএবিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিাগের ডা. ইসিরুল্লাহ্ সাইকোথেরাপি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও আরো কয়েকটি জায়গায় করা হয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারীরা কেউ সিজোফ্রেনিক ছিলনা, ছিল সোস্যাল ফোবিয়া বা সামাজ ভীতির রোগী। তবে একই ধরণের মডিউলে সামান্য পরিবর্তন এনে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপ পরিচালনা করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের ভিতর সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য কোন গ্রুপ পরিচালিত হচ্ছেনা।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাইকোথেরাপি দেয়া যায়। এভাবে সাইকোএডুকেশন, রিল্যাক্সেশন, সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি দেয়া যায়। উন্নত বিশ্বে বিশেষ ভাবে দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা এধরণের সেবা দিয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এধরণের সাইকোলজিক্যাল সেবা রোগীদের পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ করে তোলেনা। বরং এগুলো রোগীর ঔষধ গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়মিত করে, তার লক্ষণ কমায়, জীবনের গুণগত মানে উন্নয়ণ ঘটায় ও তার ডিজঅ্যাবিলিটি কমিয়ে তাকে বেশ স্বনির্ভর করে তোলে। আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমি ও আমার সহকর্মীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সাইকোথেরাপি দিয়েছি। ফলে রোগীও তার পরিবারের সদস্যরা ভাল বোধ করেছেন। রোগীর জীবনের গুণগত মান বেড়েছে। কোন কোন রোগী পেশায় যুক্ত হতে উৎসাহিত হয়েছে। বিবাহ করার ক্ষেত্রেও রোগীরা ও তার পরিবার সতর্ক হতে পেরেছে। তবে সাইকোথেরাপিতে সিজোফ্রেনিয়া ভাল হয়নি, ভাল হওয়ার লক্ষ্যও ছিলনা। তবে তারা উপকার পেয়েছে। তব সব ঘটনা একরকম যায়নি। রোগীর বাছাইয়ে অসতর্কতাও ও সাইকোথেরপি দেবার সময় কিছুটা অদক্ষতার কারণে অন্ততঃ একবার আমাকে শক্ত পিটুনি

খেতে হয়েছিল। ফলে আমি আরো সাবধান হতে পেরেছি। দেশে ব্যাপক সংখ্যক সিজোফ্রেনিক রোগীদের তুলনায় আমাদের সেবার পরিমাণ একদম শূন্যের কোঠায়। রোগীদের স্বার্থেই তাদের মনোবৈজ্ঞানিক সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর পরিবারের পরিবেশ অনেক সময় ভাল থাকেনা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অতিরিক্ত সমালোচনার চালাচালি হয়। তারা একে অপরকে মাপ করতে পারেনা। মানসিক সমর্থন দেবার বদলে চলে সমালোচনা। খুব বেশী রাগারাগি হয়। সদস্যদের আবেগের আতিশয্য থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ একসাথে থাকে, আর একে অপরের পিছেই লেগে থাকে। এই পরিবেশকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হাই এক্সপ্রেস্ড ইমোশন পরিবার' । হাই এক্সপ্রেস্ড ইমোশন বা আবেগের এই আতিশয্যের কারণে একবার সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ কমলেও আবার বেড়ে যায়। আর যদি কারো একবার লক্ষণ বাড়া থাকে তবে এই ধরণের পরিবেশের কারণে লক্ষণ সহাজে কমেনা। বিশেষজ্ঞরা ফ্যামিলি থেরপি দিয়ে এই ধরণের হাই এক্সপ্রেস্ড ইমোশন কমানোর ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় পরিবারের সকল সদস্যদের ডেকে তাদের নিয়ে বৈঠক করে কি করা যায় তা ঠিক করা হয়। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন উন্নত করার জন্য বিভিন্নমূখী পদক্ষেপ নেয়া হয়। সাধারণতঃ দুই ঘন্টা করে প্রতি পনের দিনে একটি করে ফ্যামিলি থেরাপি দেয়া হয। বাংলাদেশে খুবই স্বল্প পরিসওে (প্রায় নেই বললেই চলে) ফ্যামিলি থেরপি দেয়া হচ্ছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থস্য ইনস্টিটিউটে সিজোফ্রেনিক রোগীদের পরিবারের সদস্যদের ডেকে স্বল্প পরিসরে ফ্যামিলি থেরাপি দিয়ে আমরা ভাল ফল পেয়েছি।এধরণের থেরাপি হাই এক্সপ্রেস্ড ইমোশন কমাতে বিশেস ফলপ্রসু। ফ্যামিলি থেরাপির সেবা আরো অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার সফলতা কিন্তু সামাজিক মনোভাবের উপরও নির্ভর করে। আমরা যদি মানসিক রোগ নিয়ে লজ্জিত থাকি, রোগীদেরকে বিরক্ত করে একধরণের দূষিত আনন্দ পাই তবে চিকিৎসার সফলতা কমে যেতে পারে। ধরুণ রোগীর চিকিৎসা খুব ভাল ভাবে দেলয়া হলো। কিন্তু সে যখন কোন কাজে বাইরে গেল তখন লোকে তাকে পাগল বলে খেপালো। তাদের বাড়িকে লোকে পাগলের বাড়ি বললো। মানুষ এই রোগীর পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকার করলো। এই পরিবারটিতে নিজেদের সন্তানদের খেলতে দিলনা। ফলে পরিবারটি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সহজেই অনুমান করা যায়, এই বিচ্ছিন্নতা সিজোফ্রেনিক রোগীর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই মনোভাব পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সচেতনতা তৈরীর জন্য নানা ধরণের সামাজিক সংগঠন কাজ করা দরকার। এজন্য রোগীদেরর আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে গঠিত প্যারেন্টস অরগানাইজেশন বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়। আমাদের দেশে এধরণের সংগঠনের বিশেষ ঘাটতি আছে। আমারর জানমতে একটি মাত্র প্যারেন্টস অরগানাইজেশন আছে- 'ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন' । এর অবস্থাও নিতান্ত নাজেহাল। এদেশের সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবারেরা একসাথে মিলে সংগঠন করতে মনে হচ্ছে আগ্রহী না। আমার সন্তানের সিজোফ্রেনিয়া আছে এটা মানাই একটি বিরাট সাহসের কাজ। বলার কথা আরো পরে। সংগঠিত হয়ে সমিতি করাতো আরো সাহসের কাজ।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নতি করতে হলে এই রোগীদেও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার। বর্তমানে রোগীদের অধিকারের কথাই মানুষ বুঝেনা। মনোভাব অনেকটা এমন- 'পাগলের আবার কি অধিকার' । মানুষ মনে করে ধরে মার লাগালেই রোগী ভাল হয়ে যাবে। যে কাউকে ধরে একবার মানসিক হাসপাতালে দিতে পারলেই হয়-বোঝা গেল এটা একটা পাগল। 'কে বললো পাগল। আমি বললাম পাগল। পাগল না হলে কি পাগলের ঔষধ খায়?' যেমন ধারা মানুষ, তেমনি তার যুক্তি বোধ! পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৪' প্রণয়ণের জন্য। যদি আইনটির চূড়ান্ত সংস্করণে মানবাধিকার রক্ষিত হয় তবে আশা করা যায় দেশের সিজোফ্রেনিক রোগীদেও মানবাধিকার পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হবে। তবে সব কিছু এতো সহজে হবার নয়। বছরখানেক আগে একজন অবসর প্রাপ্ত সাইকিয়াট্রিষ্ট বলছিলেন যে, উনি যখন চাকুরীর প্রথম পর্যায়ে তখনো এই তৈরীর কাজ চলছিল। তিনি এখন অবসরে। এটা কম কথা নয়। আইনটি নিশ্চয় সাংঘাতিক মানসম্মতভাবে তৈরীর হচ্ছে তাই একটু সময় লাগছে। দেখা যাক এর শেষ কোথায় হয়।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সেবা দেয়া এক কঠিন কাজ। এজন্য পরিবারগুলো খুব চাপের মুখে থাকে। উন্নত বিশ্বে দিনের বেলার সময়টা এই রোগীরা 'ডে কেয়ার সেন্টারে' থাকে। ডে কেয়ার সেন্টারে তার নানা ধরণের সেল্ফ কেয়ার স্কিল বা স্বনির্ভরতার দক্ষতা শিখে, চিত্তবিনোদন করে ও বিশ্রাম নেয়। তারা কিছু পেশাগত কাজও শিখে। দিন শেষে রোগী তার পরিবারে ফেরত যায়। ফলে রোগী উপকৃত হবার পাশাপাশি তার পরিবারও কিছুটা হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাংলাদেশে কোন ডে কেয়ার সেন্টার নেই। আমি ইংল্যান্ডে কয়েকটি ডে কেয়ার সেন্টার দেখেছিলাম। বাংলাদেশেও এগুলো হলে রোগীরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হত।

সিজোফ্রেনিয়ার কারণ সম্পর্কে নানা রকম মত প্রচলিত। এই রোগের কারণের বিষয়ে এখনো পরিষ্কার করে জানা যায়নি। কেউ বলছে এটি মস্তিস্কের নিউরোকেমিক্যালের গন্ডগোল থেকে হয়। আবার কেউ বিভিন্ন সামাজিক কারণকে দুষছে। এমনকি কেউ কেউ এতটাও বলছেন যে, সিজোফ্রেনিয়া একটি রোগ নয়, বরং অনেকগুলো রোগকে আমরা একটি রোগ মনে করছি। নানা বিতর্ক চলছে। তবে এপর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে খুবই পরিষ্কার হয়েছেন যে, এই রোগের চিকিৎসা শুধু মাত্র ঔষধ দিয়ে হবেনা। মানসিক রোগের ডাক্তারের পাশাপাশি সাইকোলজিষ্ট, অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট, সোস্যাল ওয়ার্ক সবারই একটা ভূমিকা আছে। এছাড়া চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতেও। বাংলাদেশ ক্রমাণ্বয়ে মধ্য আয়ের দেশ হয়ে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। ভালটাই আশা করা যাক। আশা করা যাক, দেশের সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ও অন্যান্য মানসিক রোগীদেও জন্য বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমণ্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য টিম করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা মেডিকেল মডেল থেকে বের হয়ে বায়োসাইকোসোস্যাল মডেলে কাজ করবো সেই প্রত্যাশা হেকা সবার। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর চিকিৎসা সফল হতে হলে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটিকে সনাক্ত করে চিকৎসা দিতে হবে। এছাড়া সামাজিক মনোভাব পরিবর্তিত হতে হবে। রোগীদের মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

নোটঃ বর্তমান লেখাটি ‘মনভুবন’ পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় নভেম্বর ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক মোঃ জহির উদ্দিন একজন ক্লিন্যিাল সাইকোলজিষ্ট। তিনি ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে এসিসটেন্ট প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পদে কর্মরত আছেন। এই লিখাটির বিষয়ে কোন মন্তব্য থাকলে লেখকের সাথে - zahirm_bd@yahoo.com এই ই-মেইলে যোগাযোগ করুন।

সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ

বাংলাদেশে পূর্ণবয়সীদের মধ্যে শতকরা ০.৬ ভাগের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া পাওয়া গেছে। কাজেই জনসংখ্যায় এর পরিমাণ একেবারে কম নয়। মুস্কিল হলো সিজোফ্রেনিয়া সনাক্ত করা। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ বা সাইকিয়াট্রিষ্টেরা স্কিজোফ্রেনিয়া সনাক্ত করে থাকেন। দ্রুত সনাক্ত করে দ্রুত চিকিৎসা দিলে এই রোগের চিকিৎসায় ভাল ফল আশা করা যায়।

সিজোফ্রেনিয়া একধরণের গুরুতর মানসিক রোগ। এই রোগীদের বিষয়ে মানুষ জানে অনেক কম, কিন্তু প্রচন্ড কৌতুহল সবার মাঝে। অনেকে বড় মানসিক হাসপাতালে যেতে চায় মানসিক রোগী দেখতে কেমন, তারা করে কি এসব দেখতে। সবাই অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। বাস্তবে এই রোগীরা প্রচন্ড একা। মানুষ তাকে কাছে টানেনা, তাকে ভয় পায়। তাকে অধিকার বঞ্চিত করে। অনেক রোগীর রোগ নির্ণয় হতে বছরের পর বছর লেগে যায়। তাদের চিকিৎসা বিঘ্নিত হয়। অনেকেই শিকার হয় অপচিকিৎসার। কবিরাজ আর ঝাড়ফুঁকওয়ালার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়। অনেকে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পায়।

সিজোফ্রেনিয়ার অনেক ধরণের লক্ষণ আছে। এগুলোকে সাধারণভাবে ‘পজেটিভ’ ও ‘নেগেটিভ’ লক্ষণ এভাবে ভাগ করা যায়। কতগুলো বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে থাকার কথা, কিন্তু নেই, তাকে সাধারণ ভাষায় সিজোফ্রেনিয়ার নেগেটিভ সিম্পটম বা লক্ষণ বলে। আর কতগুলো বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্যে থাকার কথা নয়, কিন্তু রুগীর মধ্যে আছে, তাকে আমরা সিজোফ্রেনিয়ার পজিটিভ সিম্পটম বা লক্ষণ বলতে পারি।

নিচে সিজোফ্রেনিয়ার কতগুলো সাধারণ লক্ষণের উপর আলোকপাত করা হলো। এর থেকে আমরা রোগটি নির্ণয় করতে না পারলেও আমাদের মনে কিছুটা ধারণা তৈরী হবে যার থেকে আমরা কোন মানুষের সিজোফ্রেনিয়া থাকতে পারে বলে মনে করলে তাকে মানসিক চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে পারবো। তবে মনে রাখতে হবে সব লক্ষণ সবার মধ্যে থাকেনা। কাজেই এর কতগুলো যদি যথেষ্ট সময় ধরে থাকে ও যদি অনেক তীব্র হয় তবে আমরা রোগীকে একজন মানসিক ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিতে পারি।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে অনেক পজিটিভ লক্ষণ থাকে। প্রত্যক্ষণের অস্বাভাবিকতাকে বলে হেলুসিনেশন। সনাক্ত করার মতো কোন বাহ্যিক উদ্দীপক (যেমন, বস্তু, গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি) ছাড়াই ব্যক্তি কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করে। কোন বাহ্যিক উদ্দীপক ছাড়াই ব্যক্তি কোন কিছু শুনে, কোন কিছু দেখে, কোন গন্ধ পায়, কোন স্পর্শ পায় বা কোন স্বাদ পায়। তবে মনে রাখতে হবে কোন একটা উদ্দীপককে ভুল ব্যাখ্যা করে ভিন্ন কিছু প্রত্যক্ষণ করলে তাকে হেলুসিনেশন বলেনা। তখন এটিকে বলে ইলুশন। যেমন, রশিকে আধা অন্ধকারে সাপ হিসাবে আমরা দেখতে পারি। এটি ইলুশন। হেলুসিনেশনে কোন উদ্দীপক, যেমন, কোন প্রকৃত বস্তু, শব্দ বা গন্ধ ইত্যাদি থাকবেনা। হেলুসিনেশনের বাংলা অলীক প্রত্যক্ষণ। তবে সড়াসড়ি ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করাই ভাল। ঘুমের মুহূর্তে বা ঘুম থেকে উঠার মুহূর্তে অনেক সময় একধরণের অলীক প্রত্যক্ষণ হয়। একে কিন্তু হেলুসিনেশন বলা যাবেনা। কোন ঔষধ, নেশাদ্রব্য বা তীব্র শারীরিক অসুস্থতার কারণে হেলুসিনেশন হলে তাকেও যথার্থ হেলুসিনেশন বলা যাবেন। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের নানা ধরণের হেলুসিনেশন হয়।

রোগী কানে কথা শুনে। রোগী একাই এই কথাগুলো শুনতে পায়। আশে-পাশের কেউ এই শব্দগুলো শুনতে পায়না। বোঝানোর জন্য রোগী অনেক সময় এগুলোকে গায়েবী আওয়াজও বলে। আসলে কোন গায়েবী বিষয় এটি নয়। অসুস্থতার কারণে সে কানে এমন ধরণের অদ্ভূত কথা শুনতে পায়। একে বলে অডিটরি হেলুসিনেশন। কখনো কখনো রোগী শব্দ শুনে, বা অস্পষ্ট কথা শুনতে পায়। সবচেয়ে বেশী দেখা যায় যে, রোগীকে কেউ কিছু বলছে বা তার নাম ধরে ডাকছে বা তাকে খারাপ কথা বলছে (রোগী একাই কিন্তু এগুলো শুনতে পাচ্ছে। আর কেউ শুনছেনা।)। যারা কথা বলছে তারা পুরুষ বা মহিলা হতে পারে, পরিচিত বা অপরিচিত মানুষ হতে পারে। তারা ভাল কথাও বলতে পারে আবার সমালোচনামূলক বা অন্যান্য খারাপ কথাও বলতে পারে। সাধারণতঃ স্কিজোফ্রেনিনিয়ার রোগীরা খারাপ ও কষ্টদায়ক কথাই বেশী শুনে। কথা না শুনে যদি শব্দ শুনে বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনে তবে এই ধরণের হেলুসিনেশন তলনামূলকভাবে কম গুরুতর। রোগীরা অনেক সময় বলে যে, তারা দুই বা ততোধিক লোকের কথা শুনতে পায়। এই ধরণের হেলিউসিনেশন থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়া থাকার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থাকে। কখনো কখনো রোগী বলে যে কোন একজন মানুষ সে কি কি করছে তার একটি ধারাবিবরণ দিচ্ছে। রোগীরা অনেক সময় বলে যে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আলোচনা করছে সে এমনটা

শুনতে পাচ্ছে। সাধারণতঃ রোগীকে নিয়েই তারা আলাপ করে। এধরণের হেলিউসিনেশন থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়া থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

রোগীর শরীরে অদ্ভূত ধরণের শারীরিক অনুভূতি হয়। যেমন, শরীরে জ্বালাপোড়া হয়। এছাড়া শরীরে পিন ফোটার মতো অনুভূতি হতে পারে। শরীরের আকৃতি বা গঠন বদলে গেছে রোগী এমনটা প্রত্যক্ষণ করতে পারে। এধরণের হেলিউসিনেশনকে 'সোমাটিক' অথবা 'ট্যাকটাইল' হেলুসিনেশন বলে।

রোগী অস্বাভাবিক গন্ধ পায় যা সাধারণতঃ খুব খারাপ ধরণের হয়। অনেকসময় রোগী মনে করে যে তার শরীর থেকেই গন্ধ বের হচ্ছে। একে অলফ্যাক্টরি হেলুসিনেশন বলে।

অনেক সময় রোগী তার খাবারের মধ্যে কোন বিশেষ ধরণের স্বাদ পায়। সাধারণতঃ খারাপ স্বাদ পায়। অন্যরা একই খাবরে কিন্তু এমন স্বাদ পাচ্ছেনা। একে বলে 'গাস্টেটরি হ্যালুসিনেশন' ।

রোগী এমন মানুষদের বা এমন বস্তু বা এমন অবয়ব দেখে যা আসলে নেই। একে বলে ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশন। অনেক সময় রোগী অবয়ব বা রঙ দেখে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বা মানুষের মতো দেখতে কিছু একটা দেখে। ধর্মীয় কোন চরিত্রও রোগী দেখতে পারে। যেমন, যীশু খ্রীষ্ট, শয়তান বা স্বীন বা ভূত দেখতে পারে। ধর্মীয় বিষয়ে হেলুসিনেশন হলে তবে রোগীর শিক্ষাগত অবস্থা, তার আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপট বিচার করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশে কেউ যদি একটা ভূত দেখে তবে তা সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায়। একে হেলুসিনেশন বলা যাবেনা। কিন্তু যদি ভূতের ধারণা তেমন প্রচলিত নয় এমন সমাজে কেউ যদি ভূত দেখে তবে সেটিকে হেলুসিনেশন বলা যেতে পারে। ঘুমের সময় বা ঘুম থেকে জাগার মুহর্তে যে ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশন হয় তা সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ বলে বিবেচনা করা যাবেনা। নেশাগ্রহণের ফলে সৃষ্ট ভিজ্যুয়াল হেলুসিনেশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

চিন্তার বিষয়বস্তুর মধ্যে যখন গুরুতর অস্বাভাবিকতা পাওয়া যায় তাকে বলে ডেলুশন বা ভ্রান্তধারণা । রোগীর আর্থ-সামাজিক পটভূমি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না এমন ধরণের ভ্রান্ত ধারণাই হলো ডেলুশন। এই ধারণাগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ধরণের হয়। যুক্তি দিয়ে এই ধারণাগুলো টলানো যায়না। অবশ্য অল্পতীব্রতায় থাকলে রোগী কয়েক মাস পরে এগুলো যে ভুল সে বিষয়ে কিছুটা বুঝতে শুরু করে। তার মধ্যে এই ধারণার সত্যতা নিয়ে দ্বিধা তৈরী হয়। রোগীর আচরণ তার ডেলুশন দিয়ে প্রভাবিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। রোগী কতটা তীব্র ভাবে তার ভ্রান্তধারণা গুলোকে বিশ্বাস করে, এগুলো কতটা জটিল ধরণের, রোগী এই ধারণা দ্বারা পরিচলিত হয়ে কিছু করে কিনা, সে এই ভ্রান্তধারণাগুলোকে নিয়ে কতটা সন্দেহে ভুগে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস থেকে তার এই ডেলুশন গুলো কতটা পৃথক সে বিষয়ক তার ধারণা কি ইত্যাদি বিবেচনা করে তার ডেলুশনের অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগী বিশ্বাস করে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, বা কোন না কোন উপায়ে তার ক্ষতি করার, তার মানহানি ইত্যাদি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে পারসিকিউটরি ডেলুশন বলে। রোগী বলে যে তাকে কিছু লোক অনুসরণ করছে, কেউ তার ই-মেইল মোবাইলের টেক্সট্ মেসেজগুলো, বা ফেসবুকের উপর নিয়মিত নজরদারি করছে, তার অফিসে বা বাসায় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে, তার মোবাইলে স্পাইং করার জন্য কোন সফ্টওয়্যার বসিয়ে দেয়া হয়েছে, তার বাথরুমে মাইক্রো ক্যামেরা বসিয়ে তার অস্বস্তিকর ছবি তোলার চেষ্টা চলছে। তার খাবারে খারাপ কিছু মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই খাবার খেলে সে মারা যাবে, পাগল হয়ে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাবে। তার ঘনিষ্ঠজনই তার শত্রু ও তারা এক ধরণের গোয়েন্দাগিরি করছে ও তার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবেশীরা তার পিছে লেগেছে। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা ইত্যাদি তার পিছে লেগে গেছে। তার মাথায় মাইক্রোচিপ বসিয়ে স্যাটেলাইটের সাহায্যে বা মোবাইল নেটওয়ার্কের সাহায্যে তার ক্ষতি করার চেষ্টা চলছে। কারো কারো মধ্যে এবিষয়ে জটিল ধরণের ধারণা পাওয়া যায়। কখনো কখনো পারসিকিউটরি ডেলিউশন এত জটিল হয় যে এটি রোগীর জীবনের প্রায় সব কিছুর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার স্বামী বা স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে ডেলুশন অব জেলাসি বলে। ছোট-খাট সম্পর্কহীন বিষয়কে এই ধরণের চরিত্রহীনতার নিশ্চিত প্রমাণ হিসাবে রোগী হাজির করে। রোগী সাধারণতঃ স্ত্রীর বা স্বামীর চরিত্রহীনতা প্রমাণের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করে। একজন রোগী সন্দেহের বশবর্তী হয়ে অফিসে যাওয়া বন্ধ করলেন। তার শিক্ষিকা স্ত্রী কোন পুরুষ শিক্ষকের সাথে কথা বলে কিনা তা দেখার জন্য দিনের পর দিন পাশের নির্মিয়মান বিল্ডিং এ বসে স্ত্রীর স্কুলের উপর নজরদাড়ি করতে লাগলেন। আরেকজন বেসরকারী গোয়েন্দা ভাড়া করে স্ত্রীর পিছনে লাগালেন। আরেকজন স্ত্রী তার স্বামীর ফেসবুক হ্যাক করার জন্য প্রফেশনাল হ্যাকার ভাড়া করলেন। এছাড়া নিয়মিত মোবাইল চেক করা, ব্যাগ চেক করা, হঠাৎ বাসায় হাজির হওয়া, পনের মিনিট পর পর ফোন করাতো আছেই। এক রোগী স্ত্রীকে বাসায় তালা মেরে আটকে রেখে অফিসে যেতেন যাতে স্ত্রী বাড়িওয়ালার সাথে প্রেম করতে না পারে। স্ত্রীটি বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের খাতিরে একবার হেসেছিলেন বলে এত সাবধানতা! আরেকজন ক্রমাগত তার প্রেমিকাকে চাপ দিতে যাতে তিনি তার আগের প্রেমিকের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন। আদতে প্রেমিকাটির এমন কোন সম্পকর্ই ছিলনা।

কোন ন্যায্য কারণ ছাড়াই রোগী বিশ্বাস করে যে সে কোন সর্বনাশা অন্যায় করেছে, মাপের অযোগ্য পাপ করে ফেলেছে। এবিষয়ে রোগী সারাক্ষণ ভাবতেই থাকে ও অপরাধবোধে ভোগে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে 'ডেলুশন অব গিল্ট' অথবা 'ডেলুশন অব সিন' বলে। একজন রোগী অপরাধবোধে ভুগতো কারণ শৈশবে সে একজন মানুষের বাগান থেকে না বলে একটি গোলাপ ফুল নিয়েছিল। একজন কৈশোরে হস্তমৈথুন করেছিল বলে ভয়াবহ অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছিল। রোগী ভাবলো -'হস্তমৈথুন সৃষ্টিকর্তার বিধানের পরিপন্থি। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে মারাত্মক শাস্তি দিবেন। আমি যুগ যুগ ধরে বিধাতার কোপানলে পুড়বো।' রোগী যাকেই পায় তার কাছেই তার এই পাপের বিবরণ দিতে শুরু করলো। অর্থাৎ রোগী তার অপরাধের মাত্রাকে অনেক বাড়িয়ে দেখছে। সম্পর্ক নেই এমন কোন দূর্ঘটনার জন্য রোগী নিজেকে দায়ী মনে করতে পারে। যেমন, একটি সাইক্লোনে বহু মানুষ হতাহত হবার পর রোগী ভাবলো যে যেহেতু সে ঐ জনপদের একজনের উপর বিরক্ত ছিল তাই এই দূর্ঘটনা হয়েছে। এই অর্থে সেই এতগুলো নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সত্যি সত্যি এতগুলো মানুষকে মেরে ফেললে যে ধরণের পরিতাপ হতে পারে, তার মনের অবস্থা তেমনটিই হয়ে গেল। তবে ডেলুশন অব সিন বা ডেলুশন অব গিল্ট সিজোফ্রেনিয়ায় কম থাকে। থাকলেও তা বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকতে পারে। এগুলো থাকলে রোগীর সিজোফ্রেনিয়ার পাশাপাশি বিষন্নতা থাকতে পারে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার বিশেষ ধরণের ক্ষমতা আছে বা সে একজন বড় মাপের মানুষ। সে বিশ্বাস করে যে সে এমন একটি বিশেষ আবিষ্কার করছে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের জীবন বদলে যাবে। কেউ এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে আর রক্ষে নেই। রোগী রেগে - মেগে একদম ফায়ার হয়ে যেত। একজন নিজেকে বড় কবি ভাবতো। একজন নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে দাবী করতো ও তার বিশেষ বিশেষ কবিতা (আসলে রবি ঠাকুরের কবিতা) সবাইকে শোনাতো। একজন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে দাবী করলো। একজন নিজেকে বাংলাদেশের মালিক মনে করতো। একজন বিশ্বাস করতো যে, সে যদি উপবাস রেখে দোয়া করে তবে বিধাতা বৃষ্টি দেবেন বা খড়ার দোয়া করলে খড়া দিবেন। সে তার এই দক্ষতা দেশের কৃষিখাতের সেচপ্রকল্পে কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিল। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে 'গ্র্যান্ডিওস ডেলুশন'। তবে সিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে এধরণের ডেলুশন কম থাকে। এগুলো থাকলে রোগীর বাইপোলার মুড ডিজঅরডার আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ধর্ম সম্পর্কিত কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষন করতে পারে। অনেক সময় প্রচলিত ধর্ম মতে আছে এমন বিষয়ে রোগী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। যেমন, পুনরুত্থান বিষয়ক ধারণা, জন্মান্তরবাদ বিষয়ক ধারণা, শয়তান বা স্বীন ভর করা বিষয়ক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে রোগী ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারে। আবার অনেকে এধর্ম থেকে একটু, ও ধর্ম থেকে একটু নিজের মনগড়া একটু, এভাবে নিয়ে নতুন ধর্মমত তৈরী করে এবিষয়ে ভ্রান্তধারণা পোষণ করে। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে 'রিলিজিয়াস ডেলুশন' বলে। রোগী যদি নিজেকে একজন বড় ধর্ম প্রচারক মনে করে তবে এই ধরণের রিলিজিয়াস ডেলিউশন একই সাথে গ্রান্ডিওস ডেলুশনও হবে। যেমন, অনেকেই নিজেকে যীশু খ্রীষ্ট মনে করে মানুষকে ধর্মের পথে শেষবারের মতো আহ্বান জানাতে শুরু করে। রিলিজিয়াস ডেলিউশনের বশবর্তী হয়ে রোগী অনেক সময় এমন সব কথা বলে যাতে অনেক ধর্মমতের মানুষদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। রোগীর জন্য এর ফল মাঝে মাঝে ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় রিলিজিয়াস ডেলুশনের সাথে অন্যান্য আরো কিছু ডেলুশন যেমন, পাপবোদেও ডেলুশন, নিয়ন্ত্রিত হবার ডেলুশন ইত্যাদিও থাকতে পারে। কোন ভ্রান্তধারণা রিলিজিয়াস ডেলুশন কিনা তা রোগীর আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে নির্ধারণ করতে হবে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার দেহ কোন না কোনভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে গেছে, অস্বাভাবিক হয়ে গেছে বা বদলে গেছে। সে হয়তো বিশ্বাস করলো যে তার পাকস্থলি বা মস্তিষ্ক পঁচে গেছে। একজন মনে করতো তার মস্তিষ্ক শুকিয়ে গেছে। কেউ হয়তো বিশ্বাস করলো যে তার হাত বা গোপন অঙ্গ টেনে বড় করে ফেলা হয়েছে, বা কেউ বিশ্বাস করলো যে তার চেহাড়ার বৈশিষ্ট্য অস্বাভাবিক। এধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে 'সোমাটিক ডেলুশন' বলা হয়। কোন কোন সময়ে সোমাটিক ডেলিউশনের সাথে ট্যাকটাইল হেলিউসিনেশন বা অন্যান্য ধরণের হেলিউসিনেশন থাকতে পারে। যেমন, রোগী বিশ্বাস করে যে তার মস্তিষ্কের মধ্যে বল বিয়ারিং আছে। এগুলো একজন ডেন্টিষ্ট দাঁত ফিলিং করার সময় ওখানে রেখে দিয়েছে। এগুলো এদিক ওদিক গড়িয়ে যাচ্ছে। রোগী এমনকি এই গড়ানোর ও একটির সাথে অন্যটির বাড়ি খাবার শব্দ শুনতেও পায়।

রোগী বিশ্বাস করে যে আপাতঃদৃষ্টিতে তাৎপর্যহীণ সাধারণ ঘটনার সাথে তার বিশেষ ধরণের সম্পর্ক আছে। কেউ হয়তো সাধারণ কোন মন্তব্য করলো, কিছু একটা ঘটলো, কেউ কিছু বললো, রাস্তায় কেউ হাসলো- এগুলো সবই তাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। রোগী কোন রুমে ঢুকলো, দেখলো মানুষ হাসাহাসি করছে বা হঠাৎ সবাই নীরব হয়ে গেল। রেডিও তে বা টিভিতে কোন অনুষ্ঠান বা কোন নাটক হচ্ছে, এর মানে এগুলো তার বিষয়ে কিছু একটা বলছে। পত্রিকায় একটা খবর বের হলো, একটা সম্পাদকীয় লেখা হলো। নির্ঘাত এটি তাকে নিয়েই লিখেছে। অথবা এর মাধ্যমে তাকে কোন বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে বলে সে বিশ্বাস করলো। রোগী কিছু অদ্ভূত যুক্তিও হাজির করলে এটি প্রমাণ করার জন্য। এই ধরণের ভ্রান্তধারণা যখন যথেষ্ঠ দৃঢ় হয় তখন তাকে বলে ‘ডেলুশন অব রেফারেন্স’ ।

রোগী মনে করে যে তার চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণ অন্য কোন বাহ্যিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। সে ভিতরে ভিতরে অনুভব করে যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে ‘ডেলুশন অব কন্ট্রোল’ । তবে মনে রাখতে হবে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এটি নয়। যেমন, মানুষ বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। বস্তুতঃ তিনি সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এটি ভ্রান্তধারণা নয়। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমি কি করবো আর কি না করবো সে বিষয়ে আমাকে প্রভাবিত করতে চাইতেই পারেন। এগুলো ডেলুশন অব কন্ট্রোল নয়। বরং রোগী বলবে যে কোন একটি ভীনগ্রহের শক্তি তার দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি অদ্ভূতভাবে হাত নাড়তে ও দেহ নাড়তে তাকে বাধ্য করছে। সে যেন একটি বায়োলজিক্যাল রবোট হয়ে গেছে। তার ইচ্ছাশক্তি তার দেহকে চালিত করতে পারছেনা। বরং সেই বহিঃশক্তির আদেশ অনুযায়ী তাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে। শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে আদেশ পাঠিয়ে তার মধ্যে নানা ধরণের অনুভূতি তৈরী করা হচ্ছে। রোগী পরিষ্কার বুঝতে পারে যে এই অনুভূতি গুলো আরোপিত। তার নিজস্ব নয়। এগুলো হলো ডেলুশন অব কন্ট্রোল।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তাগুলো মানুষ পড়তে পারে। তারা তার মনে কি চলছে তা পরিষ্কার করেই পড়তে পারে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে ‘ডেলুশন অব মাইন্ড রিডিং’ ।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তাগুলো রেডিওতে যেভাবে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় সেভাবে সম্প্রচারিত হয়। ফলে রোগী নিজে বা অন্যরা এটি শুনতে পারে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে ‘থট ব্রডকাস্টিং’ । অনেক সময় রোগী বলে যে, চিন্তাগুলো যেন তার মাথার বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। এটিকে অডিটরি হেলুসিনেশন ও ডেলুশন দুটোই বলা হয়। অনেক সময় রোগী বলে যে সে নিজে শুনতে না পেলেও তার চিন্তাগুলো সম্প্রচারিত হচ্ছে। অনেকসময় রোগী বিশ্বাস করে যে তার চিন্তগুলো একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে।

রোগী বিশ্বাস করে যে তার নয় এমন চিন্তা তার মনে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন, রোগী বিশ্বাস করলো যে একজন প্রতিবেশী কোন একটি গোপন যাদুবিদ্যার সাহায্যে তার মাথায় তার নয় এমন যৌন চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে ‘থট ইনসারশন’ ।

রোগী মনে করে যে তার চিন্তাগুলো তার মন থেকে সড়িয়ে নেয়া হয়েছে। রোগী বলে যে সে একটি চিন্তা শুরু করেছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ মুহূর্তে কোন একটি বহিঃশক্তি তার চিন্তা সড়িয়ে নেয়ায় তার আর চিন্তা শেষ করা সম্ভব হয়নি। এধরণের ভ্রান্ত ধারণাকে বলে ‘থট উইথড্রয়াল’ ।

রোগীর আচার-আচরণ অস্বাভাবিক ও অদ্ভূত হয়। যেমন সে একটি বোতলে প্র¯্রাব করে, দেহের দুই অংশ দুই রঙ করে রাখে, ছোট প্রাণী, যেমন, মুরগীকে আছড়ে মারে ইত্যাদি। অনেক সময় রোগী নিজেই তার এই ধরণের আচরণের কথা বলে। আবার অনেক সময় তার পরিবারের সদস্যরা এবিষয়ে বলে। অনেক সময় তার আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করেও তার অদ্ভূত আচরণের বিষয়ে জানা যায়। যদি অ্যালকোহল বা কোন নেশাদ্রব্যের প্রভাবে কেউ অদ্ভূত আচরণ করে তবে সেগুলো এখানে বিবেচনায় আসবেনা। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিচার করে তবেই কোন আচরণ অদ্ভূত আর কোনটি স্বাভাবিক তা নির্ণয় করতে হবে।

রোগী অস্বাভাবিকভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পড়ে। এছাড়াও আরো অনেক অদ্ভূত ভাবে নিজেকে সাজায় যাতে তাকে অন্যরকম লাগে। যেমন, একটি মেয়ে তার সব চুল কামিয়ে ফেললো। কেউ তার শরীরের একেক অংশ একেক রঙে রাঙিয়ে ফেললো। সে এমন ধরণের কাপড় পড়বে যা ঐ সমাজে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। সে হয়তো রাজা-বাদশাহ্ সেজে কোমড়ে নকল তলোয়াড় ঝুলিয়ে বিবাহের দাওয়াত খেতে বা অফিসে গেল। রোগী হয়তো প্যান্টের উপর একটি আন্ডারওয়্যার পড়ে কোথাও গেল। তীব্র গরমের মধ্যে সে মোটা স্যুয়েটার পড়লো। বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াদি লিখে মাথায় ব্যান্ড পড়লো। হাতে লাঠি নিয়ে ধর্ম প্রচারকের মতো পোষাক পড়ে ধর্মীয় উপদেশ দিতে শুরু করলো।

স্বাভাবিক সামাজিক রীতিনীতির বাইরে যায় এমন সব কাজ রোগী করতে শুরু করলো। সে পরিবারের সদস্যদের সামনেই হস্তমৈথুন করতে শুরু করলো। সে নিজের গোপন অঙ্গ অন্যদের দেখাতে শুরু করলো। প্রচুর লোক থাকা সত্বেও সে মল-মূত্র ত্যাগ করতে শুরু করলো ও আশে-পাশের মানুষের বিষয়ে তার যেন কোন চেতনাই নেই। সে একা একা বিড় বিড় করে নিজের সাথেই কথা বলতে শুরু করলো। কখনো দেখেনি এমন মানুষদের সাথে অতি আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ সে বসে পড়ে প্রার্থণা শুরু করলো। বা হঠাৎ রাস্তার ভীড়ের মধ্যে যোগাসনে বসে যোগ ব্যায়াম করতে শুরু করলো। সে মানুষদেরকে অনাকাঙ্খিত যৌন ইঙ্গিত দিতে শুরু করলো।

রোগী প্রায়শঃই অত্যন্ত উত্তেজিত থাকতে পারে। প্রায়ই কোন কারণ ছাড়াই, কোন পূর্ব সঙ্কেত ছাড়াই সে হঠাৎ উত্তেজিত ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে শুরু করতে পারে। সে তার পরিবারের সদস্যদের ও বন্ধুদের সাথে প্রায়ই তর্কাতর্কি শুরু করতে পারে। রাস্তায় পথচারীদের কোন কারণ ছাড়াই অভিযুক্ত করে তাদের সাথে ঝামেলা শুরু করলো। যাদের সাথে তার কিছুটা ঝগড়া আছে তাদেরকে বা সরকারের কাছে বিদ্বেষমূলক ও হুমকিপূর্ণ চিঠি, ই-মেইল বা টেক্সট পাঠাতে শুরু করলো। কোন কোন রোগী কচিৎ প্রাণী হত্যা করতে পারে বা মানুষ নির্যাতনের, আহত করার বা হত্যার চেষ্টা করতে পারে।

রোগী বারংবার একই আচরণ করার অভ্যাস করতে পারে। এটি সে করতে একদম বাধ্য থাকে। এর নানা ধরণের অদ্ভূত ব্যাখ্যা সে দাঁড় করায়। যেমন, এই অদ্ভূত আচরণগুলো করার মাধ্যমে সে অন্যদের প্রভাবিত করছে বা অন্যদের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছে। একজন রোগী ছিল সে অদ্ভূত ভাবে নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করে মানুষের সাথে হ্যান্ডশেক করতো। একাজ করতে সে বাধ্য ছিল। কেউ নিয়ম অনুসরণ করে হ্যান্ডশেক না করে চলে যেতে নিলে সে পিছন পিছন গিয়ে ক্রমাগত অনুরোধ করে হ্যান্ডশেকের নিয়ম শেষ করতো। রোগী খাবার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও ধারাবাহিক অনুযায়ী খেতে পারে, একটা নির্দিষ্ট ধরণের পোষাক পড়তে পারে, পড়ার সময়ে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে পড়তে পারে। সে একই মেসেজ বারংবার মানুষকে পাঠাতে পারে, কখনো কখনো এই মেসেজগুলো অদ্ভূত ভাষায়ও লিখতে পারে। এক রোগী খুব খারাপ ভাষায় অশ্লীল ধরণের মেসেজ লিখে পরিচিত মানুষদেরকে পাঠাতো। এজন্য কেউ তাকে ধরলে সে অস্বীকার করতো। এভাবে বার বার সে পাঠাতে থাকতো।

ভাষার স্বচ্ছতা থাকা সত্বেও, ভাষার প্রাচুর্যতা থাকা সত্বেও কোন কারণে যদি ঠিকমতো ভাব বিনিময় বা কমিউনিকেশন করা না যায় তবে তা ‘পজিটিভ ফরমাল থট ডিজঅরডারের’ কারণে হতে পারে। এক্ষেত্রে কোন রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই রোগী একটি বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুতে সরে যেতে থাকে। আশে-পাশের পরিবেশ দিয়ে সে সহজেই প্রভাবিত হয়। তার মনোযোগ সড়ে যায়। এমন কিছু শব্দ একসাথে জুড়ে কথা বলে যেগুলোর উচ্চারণের মধ্যে বা অর্থগতভাবে মিল আছে। এটি করতে গিয়ে অনেক সময়েই তাদের কথাটির বা লাইনটির কোন অর্থই থাকেনা। তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তার উত্তর না দিয়ে অন্য একটি বিষয়ে সে প্রশ্ন করে। তাদের কথাগুলো অনেক সময় বেশ দ্রুতলয়ের হয় এবং এগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব থাকে। এই কথাগুলো অসঙ্গতিপূর্ণ হয়। রোগী যথেষ্ঠ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ কথা বলে। রোগীর কথা মনোযোগ দিয়ে মিনিট দশেক শুনলেই তার পজিটিভ ফরমাল থট ডিজঅরডার আছে কিনা তা বোঝা যায়। রোগীর কথাগুলো ধারাবহিকতা অনুসরণ করে বলছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। তার কথায় অস্পষ্টতা থাকলে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে পরিষ্কার করে বলতে অনুরোধ করতে হবে। তাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে হবে ও সে কতটা স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এবিষয়গুলোর উত্তর দেয় তা খেয়াল করতে হবে।

কথা বলার সময় রোগী একটি বিষয়বস্তু থেকে সামান্য একটু মিল আছে এমন বিষয়বস্তুতে সড়ে সড়ে যায়। এমনকি অনেক সময় এক বিষয় হতে একদম সম্পর্ক নেই এমন বিষয়বস্তুতে কথা বলতে শুরু করে। আলোচনার মধ্যে কেমন একটা খাপছাড়া ভাব থাকে। একে বলে ‘ডিরেইলমেন্ট বা লুজেনিং অব অ্যাসোসিয়েশন’।

রোগীকে একটি প্রশ্ন করলে তার উত্তরে সে এমন সব কথা বলতে পারে যার সাথে প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের সাথে খুব সামান্য সম্পর্কই আছে। আবার অনেক সময় রোগী একদম সম্পর্কহীন উত্তর দিয়ে দেয়। একে বলে 'ট্রানজ্যানশিয়ালিটি' ।

রোগী এমনভাবে কথা বলে যার কোন মানে হয়না। যেভাবে বাক্যগুলো বিন্যস্ত হবার কথা তা তেমনভাবে থাকেনা। শব্দগুলো এলোমেলোভাবে যুক্ত হয়। একে বলে 'ইনকোহেরেন্স বা ওয়ার্ড সালাদ বা স্কিজোফ্যাসিয়া' ।

আলোচনার সময় রোগী হঠাৎ এমন ধরণের সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যা ঐ আলোচনার যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। ঘটনা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌছাবার যুক্তিসঙ্গত ধারাগুলো রোগী অনুসরণ করতে পারেনা। একে বলে 'ইল্লজিক্যালিটি' ।

আলোচনার সময় কোন প্রশ্নের উত্তরে বা প্রসঙ্গক্রমে রোগী প্রচুর অপ্রসঙ্গিক কথা বলে, খামোখা মন্তব্য করে, অনেক সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত তার আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে। স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারীকে সময়মতো স্বাক্ষাতকারের কাজ শেষ করার জন্য রোগীকে বার বার মূল বিষয়ে কথা বলার জন্য বলতে হয়। একে বলে 'সারকাম্স্ট্যানশিয়ালিটি' । বাধা না দিলে রোগী বহুক্ষণ ধরে এমন ধরণের অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রী আলোচনা চালিয়ে নিতে পারে।

সাধারণ মানুষ যে পরিমাণ কথা বলে রোগী তার থেকে অনেক দ্রুত ও অনেক বেশী কথা বলতে থাকে। মনে হয় যেন, সে থামতেই পারেনা। ভিতর থেকে ক্রমাগত যেন কথাগুলো বেরিয়ে আসছে। তাকে থামানো দুরুহ হয়ে যায়। দ্রুত নতুন একটি ধারণার কথা বলার উৎসাহের কারণে রোগী অনেক সময় বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে পরের লাইনে চলে যেতে পারে। সাধারণ প্রশ্নের উত্তর যা এক দুই শব্দে বা সর্বোচ্চ এক বাক্যে দেয়া যায় তার উত্তরে রোগী মিনিটের পর মিনিট কথা বলতেই থাকে। বাধা না দিলে থামেনা। প্রায়ই বাধা দিলেও কথা চালিয়ে যায়। যার কথা বলার তীব্র আকাঙ্খা তৈরী হয়েছে এমন রোগীরা আশে পাশে কেউ না থাকলেও বা কেউ শুননতে না চাইলেও কথা বলতেই থাকে। এমনকি যখন আশে-পাশে যখন কেউ থাকেনা তখনো কথা চালিয়ে যায়। একে বলে 'প্রেসার অব স্পিচ' । মিনিটে যদি কেউ ১৫০ বা তার বেশী শব্দ বলে তবে তার 'প্রেসার অব স্পিচ' আছে। প্রেসার অব স্পিচের সাথে প্রায়ই ডিরেইলমেন্ট, ট্যানজেনশিয়ালিটি অথবা ইনকোহেরেন্স একসাথে দেখা যায়। তবে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে প্রেসার অব স্পিচ কম থাকে। এমনটা হলে মুড ডিজঅরডার আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে।

কথা বলার সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে রোগী থেমে যায়। যে বিষয়ে বলছিল বা যে বাক্যটি বলছিল তা শেষ না করে পরিবেশের কোন একটি বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে। যেমন, টেবিলে রাখা কোন কিছুর বিষয়ে বা স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারীর পোষাক নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। এবিষয়টিকে বলে 'ডিস্ট্র্যাক্টিবল স্পিচ' ।

রোগী কথার বলার সময় বা বাক্য বলার সময়, শব্দমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শুনতে মিল আছে সে সব শব্দ সেগুলো একসাথে বলে। তাতে কথার মানে না হলেও অসুবিধা নেই। আবার কোন কোন রোগী কথা বলার সময় উচ্চারণে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করে। এরপর ঐ শব্দের সাথে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করলো। তারপর তার সাথে কিছুটা মিল আছে এমন শব্দ ব্যবহার করলো। প্রতিটি বাক্যের একটি মানে দাঁড়ালেও বিষয়বস্তু অত্যন্ত অযৌক্তিকভাবে বদলে যেতে থাকায় পুরো প্যারার আর কোন সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়না। রোগী অনেক কথাই বললো, কিন্তু বোঝা গেলনা কিছু। এবিষয়টিকে বলে 'ক্ল্যনজিং' । যেমন,' নদীর কুল, কুল গাছ, গাছ পালা.. ..' এভাবে রোগী কথা চালিয়ে যেতে পারে।

রোগীর আবেগের প্রকাশটি হয় অসঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়তো তার দুঃখিত হওয়ার কথা। কিন্তু খুবই হাসি-খুশি ও আনন্দিত হলো। যেমন, একজন মহিলা রোগী হেসে একদম কুটিপাটি হয়ে বললো তার ভাল একটা ঘটনা ঘটেছে। তার মা গত বুধবার দিন মারা গেছে। এগুলো ইনকনগ্রুয়েন্ট মুডের বহিঃপ্রকাশ।

সিজোফ্রেনিয়া রোগ নির্ণয় করা অতি দুরূহ কাজ। এজন্য এখানে আলোচিত কিছু লক্ষণ দেখেই আমরা কারো সিজোফ্রেনিয়া আছে কিনা সনাক্ত করে ফেলবো এমনটা আশা করা যায়না। তবে এই লক্ষণগুলো বা এর মধ্যে কিছু লক্ষণ কারো মধ্যে যদি থাকে তবে আমরা রোগীকে একজন মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিষ্টকে দেখাতে পারি। তিনি রোগ নির্ণয় করে দেবেন। এই রোগ দ্রুত সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসায় ভাল ফল আশা করা যায়। এছাড়া দ্রুত চিকিৎসা করা গেলে রোগের ফলে রোগীর শিক্ষাগত, পেশাগত, সামাজিক, আন্তঃর্ব্যক্তিক ও পারিাবরিক জীবনে যে ক্ষতি হয় তা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এই রোগী হয়তো আপনার আশে-পাশেই আছে। হয়তো আপনার ঘনিষ্ঠ জন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সমাজের কারো এই রোগ আছে। আসুন সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের দ্রুত সনাক্ত করি ও চিকিৎসা নিশ্চিত করি।

এবার আমরা সিজোফ্রেনিয়ার নেগেটিভ লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। রোগীর চেহাড়ায় আবেগ প্রকাশের ঘাটতি দেখা যায়। অনেক সময় আবেগের কোন প্রকাশই থাকেনা। রোগীর চেহাড়া একদম কাঠের পুতুলের মতো লাগে। চেহাড়া কোনই পরিবর্তন হয়না, হলেও খুব সামান্য পরিবর্তন হয়। রোগী চুপ করে একভাবে বসে থাকে, স্বতঃস্ফূর্ত কোন নড়াচড়া তার থাকেনা। সে তার দেহ নাড়াচাড়া করেনা, পা বা হাতও নাড়ায়না। যদি কারো সামান্য হাত-পা নড়েও, তা স্বাভাবিক মানুষদের তুলনায় অনেক কম নড়ে। সাধরণতঃ আমরা কথা বার্তা বলার সময় আমাদের হাত-পা নড়াচড়া করি। কিন্তু এই রোগীরা তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য হাতের নড়াচড়া, সামনের দিকে বা পিছের দিকে ঝুঁকে বসা ইত্যাদি করেনা বা করলেও তা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক কম করে। রোগীর দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি দিলে সে তার উত্তরে হাসেনা। রোগী কথা বলার সময়ও মানুষের চোখের দিকে না তাকিয়ে শূন্যে তাকিয়ে কথা বলে। সে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য চোখের ব্যবহার করতে পারেনা। কথা বলার সময় রোগীর স্বরের স্বাভাবিক উঠানামা থাকেনা। বরং সে একঘেয়ে সুরে কথা বলতেই থাকে। গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোতে সে স্বরের উঠানামা করিয়ে জোড় দিতে পারেনা। সাধারণ মানুষ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্বরের উঠানামা করায়। কিন্তু রোগী তার ব্যক্তিগত গোপন কথা বলার সময়ও স্বর নামাতে পারেনা আবার যখন জোড়ে কথা বললে গুরুত্ব বাড়বে এমন পরিস্থিতিতেও স্বর উচ্চে উঠাতে পারেনা। এমনকি উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার বিবরণ দেবার সময়ও সে একঘেয়ে সুরে কথা বলতে থাকে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে, তাদের মনোজগতের প্রক্রিয়ার মধ্যে একধরণের ঘাটতি দেখা যায়। তাদের চিন্তার মধ্যে একধরণের ফাঁকা ভাব আছে, তারা চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক ধীরগতির। যেহেতু চিন্তাকে সরাসরি দেখা যায়না, তাই রোগীর কথা থেকে চিন্তার বিষয়ে অনুমান করতে হয়। রোগী খুব কম কথা বলে। একে পভার্টি অব স্পিচ বা চিন্তার শূণ্যতা বলে। এই রোগীদের প্রশ্ন করলে স্বতস্ফূর্ত উত্তর দেয়না। উত্তরগুলো হয় সংক্ষিপ্ত, মূর্ত ও ব্যাখ্যা ছাড়া। জিজ্ঞাসা না করলে রোগী অতিরিক্ত কোন তথ্যই দিতে চায়না। এক-দুই শব্দে প্রশ্নের উত্তর দেয়। কোন কোন প্রশ্নের একদম কোন উত্তরই দেয়না। তার সাথে যিনি কথা বলেন তাকে ক্রমাগত আরো তথ্যের জন্য জিজ্ঞাসা করতে হয়। রীতিমত উৎসাহিত করতে হয়। রোগীর সাথে কথা বলার সময় তার কথা লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝতে পারা যায়।

আবার কোন কোন রোগী অনেক কথা বললেও তার মধ্যে বক্তব্য খুব একটা থাকেনা। ভাষা অস্পষ্ট হয়, অতিরিক্ত মূর্ত বা অতিরিক্ত বিমূর্ত হয়, পুনরাবৃত্তিমূলক ও একটি নির্দিষ্ট ধরণ অনুসরণ করে সে কথা বলে। স্বাক্ষাতকারগ্রহণকারী লক্ষ্য করলে দেখেন যে, রোগী অনেক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে তেমন তথ্য নেই। অনেক ক্ষেত্রে তার কথায় তথ্য থাকে ঠিকই, কিন্তু অনেক গুলো কথার মধ্যে এক - দুই লাইনে বলা যায় এমন সংক্ষিপ্ত পরিমাণ তথ্য থাকে। এই ধরণের কথাকে ফাঁকা দর্শন কপচানোও বলা যেতে পারে।

কোন কোন রোগী কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। একে বলে ব্লকিং। ব্লকিং-এ চিন্তাটি শেষ হবার আগেই হঠাৎ বিঘিœত হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর রোগী কি বলতে যাচ্ছিল বা বলছিল তা ভুলে যায় ও আর কথাটি শেষ করতে বা চালাতে পারেনা। হঠাৎ থামার কারণ জিজ্ঞাসা করলে যদি সে কি বলছিল তা হারিয়ে গেছে বা ভুলে গেছে বলে উল্লেখ করে তবে ব্লকিং এর ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারি।

আবার কাউকে প্রশ্ন করার অনেকক্ষণ পর সে উত্তর দেয়। সে কেমন যেন আনমনা থাকে। অনেক সময় প্রশ্নকর্তার মনে সন্দেহ হয় যে, রোগী আদতেও প্রশ্নটি শুনেছে কিনা। জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে যে, সে প্রশ্নটি শুনেছে কিন্তু চিন্তাগুলো গুছিয়ে একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে তার সমস্যা হচ্ছে, সময় লাগছে।

সিজোফ্রেনিয়া রোগীর কোন কাজ করার মতো স্পৃহা, শক্তি বা আগ্রহ থাকেনা। অনেক ধরণের কাজ তারা শুরু বা শেষ করতে পারেনা। এই ব্যর্থতার ফলে রোগীদের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে গুরুতর ক্ষতির সৃষ্টি হয়। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতি রোগীর মনোযোগ কমে যায়। সে এক কাপড় বহুদিন ধরে পড়ে থাকে। একদম জীর্ণশীর্ণ কাপড়। কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকেনা, গন্ধ হয়ে যায়। গোসল কম করে, চুল আঁচড়ায়না, নখ কাটেনা, দাঁত মাজেনা। ফলে চুল আগোছালো থাকে, চুলে জটা ধরে যেতে পারে। তাদের হাত নোংরা থাকে, শরীরে দূর্গন্ধ হয়, দাঁত ময়লা থাকে, শ্বাসে গন্ধ হয়। সার্বিকভাবে তাদের দেখতে মোটেই সুবিধার লাগেনা। কারো কারো পায়খানা-প্র¯্রাবের অভ্যাসের মধ্যেও গোলমাল লেগে যায়। ঘর ও কাপড়-চোপড় নোংড়া করে ফেলে।

সিজোফ্রেনিক রোগী শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন টিকিয়ে রাখতে পারেনা। রোগী যদি ছাত্র হয় তবে সে বাড়ির কাজ করেনা এমনকি ক্লাশেও অনুপস্থিত থাকে। তার পরীক্ষার ফলও খারাপ হয়। সে প্রায়ই কলেজে অনেক গুলো কোর্স নিয়ে পড়া শুরু করে, কিন্তু শিক্ষা বর্ষ শেষ হবার পূর্বেই পড়া ছেড়ে দেয়। রোগী কোন কাজে টিকে থাকতে পারেনা। তাদের কোন কাজে লেগে থাকা বা কাজটি শেষ করার ধৈর্য্যের অভাব আছে। এছাড়া সে দায়ীত্বশীল আচরণ করতেও ব্যর্থ হয়। সে কাজে প্রতিদিন যেতে পারেনা, দেরিতে কর্মস্থলে পৌঁছে, কাজের সময়ে এলোমেলো ঘোরাফেরা করে, কর্মস্থল দ্রুত ত্যাগ করে, কাজগুলো আগোছালো ভাবে সম্পন্ন করে। সে হয়তো বাড়িতে বসে থাকলো। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েও কাজ খোঁজার কোন চেষ্টাই করলোনা। যদি চাকুরী খুঁজেও তা করে অনিয়মিত ও এলোমেলো ভাবে। গৃহবধূ বা অবসরপ্রাপ্ত মানুষগুলো ঘরের কাজ ঠিকমতো করতে পারেনা, তারা ঘর পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা ফেলা, বাসন-কোসন ধোয়া ইত্যাদি করতে পারেনা। কেউ কেউ করলেও করে যেনতেন ও অনিচ্ছুক ভাবে। শারীরিক ভাবে রোগীরা একদম গুটিয়ে যায়। একটা চেয়ারে একটুও নড়া-চড়া না করে সে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারে। তাকে কিছু করতে বললে অল্প সময়ের জন্য কোন একটা কাজে অংশ নিয়ে সরে পড়ে ও একা আবার বসে থাকে। যেসব কাজে তেমন কোন অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়না তেমন কাজে রোগী অনেক সময় ব্যয় করে। যেমন, বসে বসে টিভি দেখে। রোগীর আত্মীয়রা বলে যে রোগী দিনের বেশীর ভাগ সময় কিছুই না করে চুপ করে বসে বা শুয়ে কাটিয়ে দেয়। তার নিজের রুমেই তার সময় কেটে যায়।

সিজোফ্রেনিযার রোগীর আগ্রহ ও আনন্দ নেবার প্রবণতা কমে যায়। আগে যেসব কাজে আগ্রহ পেত এখন আর পায়না, যেসব কাজে অন্যরা আনন্দ পায় রোগী তাতেও আনন্দ পায়না। রোগীর আগ্রহের বা সখের কিছু থাকেনা। থাকলেও তা খুব কমে যায়। লক্ষণটি ধীরে ধীরে শুরু হয়। আগের অবস্থার তুলনায় রোগী অনেকটা বদলে যায়। যাদের এই লক্ষণ একটু কম তীব্র তারা এমন কিছু কাজকর্মে অংশ নেয় যেগুলোতে তাকে ততটা স্বক্রিয় থাকতে হবেনা। যেমন, টিভি দেখা বা কোন কাজে সাময়িক আগ্রহ দেখানো। গুরুতর লক্ষণ যুক্ত রোগীরা সব ধরণের কাজে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে ও বিশেষতঃ আনন্দের কিছুই করেনা। রোগী যৌন বিষয়ে ততটা আগ্রহী হয়না । দেখা যায় স্ত্রী বা স্বামীর অনুরোধেই কেবল রোগী যৌন ক্রিয়ায় অংশ নেয়, নিজের আগ্রহ থাকেনা। অনেক ক্ষেত্রে যৌন মিলন একদম বন্ধ করে দেয়। রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে রোগী বলে যে তার যৌন বিষয়ে আগ্রহ একদম কমে গেছে বা যৌন কাজে সে আনন্দ পায়না বা খুব কম পায়। সিজোফ্রেনিক রোগীরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে বা অনুভব করতে পারেনা। তারা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি, নিজের ভাই-বোনের প্রতি ও বাবা-মায়ের প্রতি ঘনিষ্ঠতা অনুভব করেনা। বিবাহিত রোগীরা তার স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ঘনিষ্ঠতা অনুভ করেনা। তাদের ¯স্নেহ-মমতা কমে যায়। তারা একা থাকতে পছন্দ করে ও জীবন-সঙ্গী/ সঙ্গিনীর সাথে মেশার ইচ্ছা থাকেনা। নানা ধরণের সামাজিক কাজকর্মেও রোগী আগ্রহ হারায়। সম লিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের বন্ধু- বান্ধবীদের প্রতি সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে রোগীর আগ্রহ কমে যায়। একা থাকতেই পছন্দ করে।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের মনোযোগ দেবার ক্ষমতা কমে যায়। তারা মনোযোগ দিতে সমস্যা বোধ করে বা সাময়িক ভাবে মনোযোগ দিতে পারে, কিন্তু বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারেনা। তাদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা হয়তো তা অগ্রাহ্য করে। স্বাক্ষাতকার নেবার সময় আনমনা থাকে বা উঠে অন্য কোন দিকে চলে যায়। তার এই মনোযোগের সমস্যার বিষয়ে সে সচেতন বা অসচেতন দুইই থাকতে পারে। সামাজিক পরিবেশে রোগীকে অমনোযোগী বলে মনে হয়। আলোচনার সময় সে আরেক দিকে তাকিয়ে থাকে, আলোচনার পর্যায়ক্রমে সে

কোন বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারেনা, তাকে দেখে বোঝা যায় যে সে যেন এখানে নেই। যখন খেলাধুলা করে, টেলিভিশন দেখে বা পত্রিকা পড়ে তখনো রোগীর মনোযোগ কম থাকে। পর্যাপ্ত বুদ্ধি মত্তা ও শিক্ষাগত সাফল্য থাকা সত্বেও রোগী সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপকারী অভীক্ষায়ও খারাপ করে। সাধারণ শব্দের উল্টো করে বানান করতে বললে, যেমন, 'পৃথিবী' শব্দটির উল্টো করে বানান করতে বললে রোগী তা পারেনা। রোগীকে ১০০ থেকে সাত করে বা তিন করে অন্ততঃ পাঁচ বার বিয়োগ করতে দিলে তা রোগী পারেনা। তবে এই ধরণের কাজ রোগীকে দিতে গেলে আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে রোগী শিক্ষিত হয়। অশিক্ষিত রোগী শিক্ষার অভাবের কারণেই এটা পারবেনা। অশিক্ষার কারণে না পারলে তা কিন্তু লক্ষণ হবেনা।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, সাইকোথেরাপি বিভাগ, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা। ইমেইলঃ zahirm_bd@yahoo.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ডা. ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।

নোটঃ বর্তমান লেখাটি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে নভেম্বর ২০১৪-তে লেখা হয়।